বিজ্ঞান মুকুল

শ্রীবীরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকর্তা কর্তৃক পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যরূপে অনুমোদিত
(১৯৫৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেট দ্রষ্টব্য)

বিজ্ঞান-মুকুল

(পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য)

হাওড়া জিলা-স্কুলের প্রধান শিক্ষক
শ্রীবীরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী এম. এস্-সি. ; বি. টি.
(ডব্ল্যু-বি. ই. এস্.)
প্রণীত

প্রকাশ ভবন লিমিটেড : কলিকাতা—১২

প্রকাশক—দুর্গাপদ ঘোষ
প্রকাশ ভবন লিমিটেড,
২০৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

দ্বিতীয় সংস্করণ—ডিসেম্বর, ১৯৫৩
তৃতীয় সংস্করণ—জানুয়ারী, ১৯৫৫

এক টাকা দু' আনা

মুদ্রাকর—শ্রীঅরবিন্দ সরদার
শ্রী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৮।৩ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

বিজ্ঞান-মুকুল

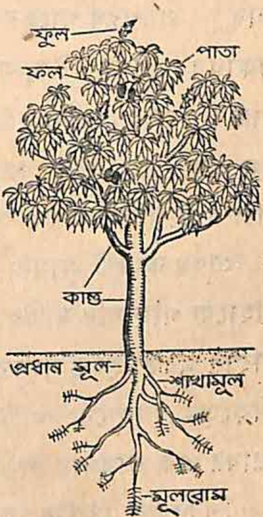
প্রথম পরিচ্ছেদ

গাছপালার কথা

গাছপালা এক রকমের নয়, নানা রকমের। বৈজ্ঞানিকেরা এই সব গাছপালা সম্বন্ধে অনেক খবর সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা সাধারণত যে-সব গাছপালা দেখিতে পাই, সেগুলি লইয়া কিছু আলোচনা করিব।

গাছের অংশ—বাগান হইতে যে কোন একটি ফুলের গাছ উপড়াইয়া আনিলে অনায়াসেই দেখিতে পাইবে, সাধারণ গাছের কি কি অংশ থাকে। অংশগুলির নাম—

১। শিকড় বা মূল ২। কাণ্ড ও ডালপালা ৩। পাতা ৪। ফুল ও ফল।



গাছের বিভিন্ন অংশ

একে একে এই অংশগুলি লইয়া আলোচনা করিলে সাধারণ গাছ সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি জানিতে পারিব। কিন্তু আলোচনা শুরু করিবার আগে একটি কথা মনে রাখা দরকার। আমাদের শরীরের নানা অঙ্গ। এক একটি অঙ্গের উপর এক এক রকম কাজের ভার। যেমন, পায়ের সাহায্যে আমরা চলাফেরা করিতে পারি, হাতের

সাহায্যে পারি নানারকম কাজকর্ম করিতে। গাছের বেলাতেও অনেকটা এই রকম। শিকড়, কাণ্ড, পাতা ও ফুল—এই সব বিভিন্ন অংশের উপর বিভিন্ন কাজের ভার রহিয়াছে। তাই, গাছের অংশগুলি লইয়া আলোচনা করিবার সময় দেখিতে হইবে, কোন্ কোন্ অংশের উপর কি কি কাজের ভার।

শিকড়

(ক) **শিকড়ের কাজ**—গাছের শিকড়ের উপর কোন্ কাজের ভার? সাধারণ গাছের বেলায় শিকড়ের কাজ প্রধানত দুই প্রকার। প্রথম হইল, মাটির উপর গাছকে গাঁথিয়া রাখিবার কাজ। আর দ্বিতীয় হইল, মাটির ভিতর হইতে গাছের জন্য জল এবং সেই সঙ্গে আরো কয়েক রকম অত্যন্ত দরকারী খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করা।

প্রথম কাজটি আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। শিকড়ের সাহায্যে গাছ যদি মাটির বুকে গাঁথা না থাকিত তাহা হইলে তাহার অবস্থা হইত সমুদ্রের বুকে নোঙর-ছেঁড়া জাহাজের মত। শিকড়ের সাহায্যে মাটির সঙ্গে গাঁথা থাকে বলিয়াই গাছ বরাবর এক জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে।

শিকড়ের দ্বিতীয় কাজ, মাটির ভিতর হইতে জল এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করা। যদি খুব খুঁটাইয়া পরীক্ষা কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে —সাধারণ গাছের বেলায় একটি প্রধান শিকড় থাকে। তাহাকে **প্রধান মূল** বলে। এই প্রধান-মূল হইতে ডালপালার ন্যায় অরো অনেক ছোটখাট শিকড় বাহির হইয়াছে। তাহার

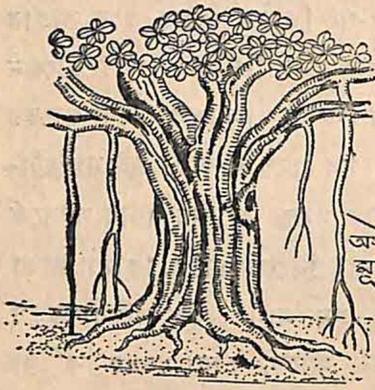
নাম দেওয়া হয় **শাখা মূল**। শাখা-মূলের মাথার কাছাকাছি কতকগুলি রোঁয়া-রোঁয়া জিনিস বাহির হইয়াছে। উহাদের বলে **মূল-রোম**। এই মূল-রোমের সাহায্যে গাছ মাটির ভিতর হইতে জল ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে।

মূল-রোম মাটি হইতে যে-সব জিনিস সংগ্রহ করে তাহার মধ্যে প্রধান হইল নাইট্রোজেন-ঘটিত জিনিস। নাইট্রোজেন একরকম গ্যাস। শেষ পর্যন্ত যে-সব মালমশলা দিয়া গাছের দেহ গড়িয়া উঠে তাহার মধ্যে সব চেয়ে দরকারী এই নাইট্রোজেন। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর শরীর সম্পর্কে এই একই কথা খাটে। নাইট্রোজেন-ঘটিত জিনিস ছাড়া কোনও প্রাণীর দেহ গঠিত হয় না। কিন্তু পৃথিবীতে যে কাঁচা নাইট্রোজেনের যোগান আছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া দেহবস্তুতে পরিণত করা সম্ভব একমাত্র গাছপালার পক্ষেই। শুধু গাছপালাই পৃথিবী হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া দেহবস্তুতে পরিণত করিতে পারে বলিয়া শেষ পর্যন্ত সমস্ত প্রাণী গাছপালার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। তুমি হয়ত বলিবে, কই বাঘ তো গাছপালা জাতীয় কিছু আহার না করিয়াও বাঁচিয়া থাকে। উত্তরে বৈজ্ঞানিকেরা বলিবেন: বাঘ গরু-ভেড়া খাইয়া বাঁচিয়া আছে—কিন্তু গাছপালা না খাইলে গরু-ভেড়া বাঁচিত কি করিয়া?

(খ) রকমারি শিকড়—শুরুতেই বলিয়াছি, গাছপালা এক প্রকার নহে। গাছ যেমন নানা রকমের, শিকড়ও তেমনি নানা রকমের দেখিতে পাওয়া যায়। আম-জাম, পেয়ারা-কাঁঠাল, গাঁদা-জবা প্রভৃতি সাধারণ গাছের বেলায় শিকড়

থাকে মাটির নীচে। কিন্তু কয়েক প্রকার গাছের শিকড় কাণ্ডের গোড়া হইতে বাহির না হইয়া গাছের অন্যান্য স্থান হইতে বাহির হয়। ইহাদিগকে সাধারণভাবে **অস্থানিক** মূল বলে।

যেমন ধর, বটগাছ। মাটির ভিতর শিকড় গজানো ছাড়াও ইহাদের ডালপালা হইতে কিভাবে মাটির দিকে শিকড় নামিয়া আসে, তাহা তোমরা নিশ্চয় দেখিয়াছ। চল ত কথায় আমরা এই জাতীয় শিকড়কে ঝুরি বলিয়া থাকি।



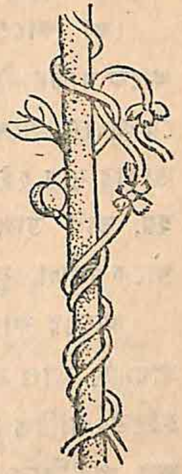
বটের ঝুরি

কিংবা ধর, কেয়া-গাছের কথা। বটগাছের ন্যায় ইহার শিকড় ডালপালা হইতে মাটির দিকে ঝুলিয়া পড়ে না; আবার আম-জাম বা কাঁঠাল-পেয়ারা গাছের মত ইহার সবটুকু শিকড় মাটির ভিতর লুকাইয়াও থাকে না। কেয়াগাছের দিকে নজর করিলে দেখিতে পাইবে, কতকগুলি শিকড় কাণ্ডের



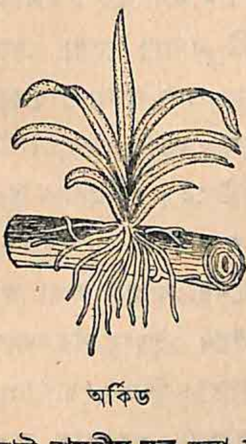
কেয়াগাছের ঠেস-মূল

পাশ দিয়া বাহির হইয়াছে এবং সেইগুলিতে ঠেস দিয়া গাছ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই ধরনের শিকড়ের নাম **ঠেস মূল**।



স্বর্ণলতা

আবার কতকগুলি গাছগালাকে বলা হয় পরগাছা। পরগাছার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নিজের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিবার উপায় নাই; ইহারা বাঁচিয়া থাকে অন্য গাছের উপর নির্ভর করিয়া। তাই ইহাদের এইরূপ নাম। যে-গাছের উপর নির্ভর করিয়া ইহারা বাঁচে, সেই গাছের ডালপালার মধ্যে ইহারা নিজেদের সরু সরু শিকড় ঢুকাইয়া দেয় এবং অনেকটা জোঁকের মত সেই ডালপালার ভিতর হইতে ইহারা নিজেদের জন্য খাদ্য শুষিয়া লয়। তাই পরগাছার শিকড়ের নাম **শোষক মূল**।



অর্কিড

পরগাছার উদাহরণ হইল স্বর্ণলতা, ছোটমান্দা, বড়মান্দা ইত্যাদি।

আবার ধর, অর্কিড জাতীয় গাছের কথা। লক্ষ করিলেই দেখিবে ইহাদের কতকগুলি শিকড় হাওয়ার মধ্যে দুলিতেছে। এই শিকড়গুলির সাহায্যে ইহারা হাওয়া হইতে খাবার সংগ্রহ করে। ইহাদের ঐ শিকড়কে তাই **বায়বীয় মূল** বলা হয়।

কাণ্ড

(ক) **কাণ্ডের কাজ**—সাধারণ গাছপালার বেলায় শিকড় থাকে মাটির নীচে। শিকড়ের পর মাটির উপর হইতে গাছের যে প্রধান অংশটি সোজা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে, তাহার নাম হইল কাণ্ড। এই কাণ্ড হইতে ডালপালা বাহির হয়, তাই ডালপালাও কাণ্ডের অংশ। ডালপালার উপর থাকে পাতা, ফুল ও ফল।

কাণ্ডের কাজ কি? কাণ্ডের কাজ প্রধানত তিন প্রকারের। প্রথমত, কাণ্ড না থাকিলে পুরা গাছের গড়ন এই প্রকার হইতে পারিত না; কাণ্ডের সাহায্যেই গাছ পাতা, ফুল, ফল প্রভৃতিকে আলো-বাতাসে ছড়াইয়া রাখিতে পারে। দ্বিতীয়ত, পাতা অধ্যায়ে তোমরা জানিবে সাধারণ গাছের বেলায় খাবার তৈয়ারীর কারখানা হইল সবুজ পাতা; অথচ খাবার তৈয়ারীর জন্য জল ও অন্যান্য উপাদান সংগ্রহ হয় মাটির নীচে শিকড়ের মধ্যে। এখানে একটি সমস্যা দেখা দেয়। সমস্যাটি হইল, শিকড়ের মুল-রোম দিয়া গাছপালা খাবারের যে-উপাদান সংগ্রহ করে তাহা সবুজ পাতা পর্যন্ত চালান দেওয়া। এই কাজের দায়িত্বও কাণ্ডের উপর। পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, কাণ্ডের ভিতর দিয়া সূক্ষ্ম শিরা চলিয়াছে; ঐসব শিরার ভিতর দিয়াই মূল-রোমের সংগ্রহ করা জল ইত্যাদি সবুজ পাতা পর্যন্ত গিয়া পৌঁছায়। ইহার পর অবশ্য আরো সমস্যা থাকিয়া যায়। সবুজ পাতার ভিতর যে খাবার তৈয়ারী হইল, তাহাও তো সারা গাছময় সরবরাহ করা

প্রয়োজন। এই তৃতীয় কাজের দায়িত্বও কাণ্ডের উপর। কাণ্ডের ভিতরকার ঐ শিরাগুলির মধ্য দিয়াই তৈয়ারী খাবার গাছের সর্বত্র সরবরাহ হয়।

(খ) **কাণ্ডের অংশ**—কাণ্ড হইতেই ডালপালা বাহির হয়; ডালপালা বা শাখা-প্রশাখা কাণ্ডেরই অংশ। একটি সাধারণ গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া আন। দেখিবে ডালের উপরকার কোন কোন জায়গা হইতে পাতা বাহির হইয়াছে। এই সব জায়গাকে চলতি ভাষায় আমরা গাঁট বলি। বৈজ্ঞানিকেরা ইহার নাম দেন **পর্ব** বা **পাব**। দুইটি গাঁট বা



কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ

পাবের মাঝখানে যে-অংশ তাহার নাম **পর্ব-মধ্য**। ভাল করিয়া নজর করিলে দেখিতে পাইবে, প্রত্যেক পাতার কোলে একটি করিয়া কুঁড়ি রহিয়াছে। ইহার নাম দেওয়া হয় **কক্ষ মুকুল**। ইহা ছাড়া, ডালটি যেখানে একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছে সেখানেও এক প্রকার মুকুল থাকে; এই মুকুলকে বলা হয় **শীর্ষ মুকুল**। গাছের পক্ষে এই শীর্ষ মুকুলগুলি অত্যন্ত দরকারী। এইগুলির বাড়ের উপরেই গাছের বাড় নির্ভর করে। কক্ষমুকুলও কম দরকারী জিনিস নহে।

উহার বাড়ের উপর গাছের শাখা-প্রশাখা গজানো নির্ভর করে। তাল, নারিকেল বা সুপারী গাছের যে শাখা-প্রশাখা নাই, তাহার কারণ হইল এই কক্ষমুকুলের অভাব।

(গ) **রকমারি কাণ্ড**—সাধারণ গাছের বেলায় কাণ্ডটি গোল এবং উহা সবল বলিয়াই খাড়া ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু সব গাছপালার বেলাতেই তাহা হয় না। যেমন ধর—মনসা, মুথাঘাস বা মাতুরকাটি গাছের কাণ্ড তেকোণা ; তুলসীগাছের কাণ্ড চারকোণা ; ফনিমনসার কাণ্ড চ্যাপ্টা। আবার লাউ, কুমড়া, পটল, পুঁই প্রভৃতি গাছের কাণ্ড দুর্বল বলিয়া সেগুলি কি রকম নেতাইয়া থাকে তাহা নিশ্চয়ই নজর করিয়াছ। সেজন্যই তো ইহাদের জন্য মাচা বাঁধিবার দরকার পড়ে।

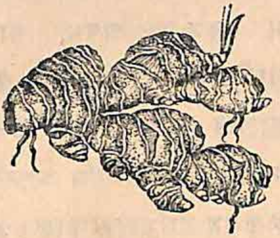


ফনিমনসা

আবার কতকগুলি গাছ আছে, যাহাদের কাণ্ড মাটির নীচে লুকাইয়া থাকে। বাজার হইতে আমরা যে আদা, হলুদ, ওল, আলু বা পেঁয়াজ কিনিয়া আনি, আসলে তাহা ঐ সব গাছের কাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নহে।

আবার অন্য কতকগুলি গাছের বেলায় কাণ্ডের চেহারা বদলাইয়া নানা প্রকারের হইয়া যায়। যেমন ধর—লাউ, কুমড়া প্রভৃতি লতা-গাছের বেলায় শাখা-প্রশাখার আগাটা বদলাইয়া সরু সূতার মত হইয়া যায়; তাহারই সাহায্যে লতা-গাছ অন্য কিছুকে জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিতে পারে। এই জাতীয়

বিকৃত কাণ্ডের নাম দেওয়া হয় **আকর্ষ**। ইহা কাণ্ডেরই

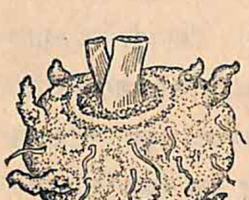


আদা

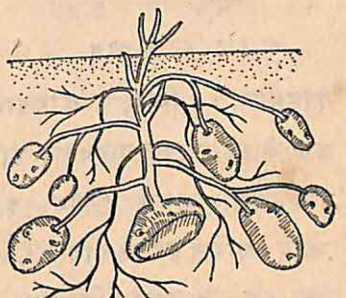


পেঁয়াজ

অংশবিশেষ। ফণিমনসা গাছের কাণ্ড বদলাইয়া পুরু সবুজ



ওল



আলু

পাতার মত হইয়া যায় এবং সবুজ পাতারই কাজ করে।

পাতা

(ক) **পাতার অংশ**—পাতার চওড়া অংশের নাম **ফলক**। ফলকের মধ্যে অনেক **শিরা-উপশিরা** থাকে। ফলকের নীচের

অংশ **বোঁটা** এবং বোঁটার যে অংশটুকু কাণ্ডের গায়ে লাগিয়া থাকে উহা বোঁটার **গোড়া**।

(খ) **পাতার কাজ**—সাধারণ সবুজপাতা-ওয়ালা গাছের বেলায় পাতার কাজ প্রধানত তিন রকম। প্রথম, খাবার তৈয়ারীর কাজ ; দ্বিতীয়, শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ এবং তৃতীয়, আমরা যে রকম ঘামি অনেকটা সেই রকম ঘামিবার কাজ। একে একে এই তিনটি কাজের আলোচনা করিব।



পাতার বিভিন্ন অংশ

(১) **খাবার তৈয়ারী**— সবুজ পাতারা যেন খাবার তৈয়ারীর কারখানা। কিন্তু, কারখানায় কিছু তৈয়ারী হওয়ার জন্য কাঁচা মালের সরবরাহ চাই। গাছের পাতার মধ্যে কাঁচা মালমশলা আসে কোথা হইতে ? অর্থাৎ সবুজ পাতারা কোন্ জিনিস হইতে খাবার তৈয়ারী করে ? এক রকম জিনিসের কথা একটু আগেই বলিয়াছি—শিকড়ের মূল-রোম মারফত মাটি হইতে জল ইত্যাদি সংগ্রহ হয় ; কাণ্ডের ভিতরকার শিরা দিয়া এই জল সবুজ পাতার মধ্যে গিয়া পৌঁছায়। কিন্তু শুধু ঐটুকু কাঁচা মাল হইলেই হয় না। তাহা ছাড়া বাতাসেরও দরকার হয়। কেননা বাতাসের মধ্যে যে অঙ্গারাম্ল গ্যাস আছে, খাবার তৈয়ারীর কাঁচা মাল হিসাবে উহার প্রয়োজন খুব বেশি।

অঙ্গারাম্ল হইতে পাতার সবুজ কণা অঙ্গার গ্রহণ করে এবং অম্লজান বা অক্সিজেন ত্যাগ করে। কিন্তু পাতারা বাতাস সংগ্রহ করে কি করিয়া ? তাহাদের গায়ে অত্যন্ত ছোট ছোট ফুটা আছে—ফুটাগুলি এত ছোট যে, শুধু-চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না ; অণুবীক্ষণের মধ্য দিয়া অনেক বড় করিয়া দেখিলে তবেই নজরে পড়ে। এই ছিদ্রগুলির নাম **ষ্টোমা**। এই সব ছিদ্র দিয়া পাতার ভিতর বাতাস প্রবেশ করে।

ইহার পর আরো সমস্যা আছে। কারখানা তো আপনা-আপনি চালু থাকে না ; তাহা চালু রাখিবার জন্য শক্তির প্রয়োজন। সেই জন্যই তো বড় বড় কারখানায় বিরাট বিরাট চুল্লী থাকে; সেইখানে কয়লা পোড়াইয়া শক্তির যোগান পাইবার ব্যবস্থা হয়। সবুজ পাতার কারখানায় এই শক্তির যোগান আসে কোথা হইতে ? বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, শক্তির যোগান আসে সূর্যের আলো হইতে। সবুজ পাতারা তাই যতক্ষণ সূর্যের আলো পায়, শুধু ততক্ষণই তাহাদের মধ্যে খাবার তৈয়ারীর ব্যবস্থা চালু থাকে। অর্থাৎ রাতের বেলায় এই কারখানার কাজ বন্ধ। দিনের বেলায়ও পাতার কোন অংশের উপর যদি রাংতা বা ঐ ধরনের কিছু ঢাকা দিয়া দাও—তাহা হইলে দেখিবে, ঢাকা দেওয়া অংশটুকুর মধ্যে খাবার তৈয়ারী হয় নাই। সেই অংশ সূর্যের আলো পায় নাই বলিয়া এইরূপ ঘটে।

(২) **শ্বাস-প্রশ্বাস**—যে-কোন জীবের পক্ষেই শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজন। শ্বাসপ্রশ্বাস মানে কি ? প্রশ্বাস হইল বাহিরের

হাওয়া হইতে শরীরের জন্য অক্সিজেন সংগ্রহ করা এবং নিশ্বাস হইল বাহিরের হাওয়ার মধ্যে অঙ্গারাম্ল গ্যাস ফেরত দেওয়া। আমাদের মত গাছপালারাও সর্বক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায় এবং কাজটা চালায় প্রধানত তাহাদের পাতার মারফতেই, কাণ্ডও অবশ্য এই কাজ কিছুটা করে। কিন্তু দিনের বেলায় এ কাজ বেশি টের পাওয়া যায় না। কারণ সবুজ পাতা তখন অঙ্গারাম্লকে খাদ্য তৈয়ারীর কাজে লাগাইয়া ফেলে। কাজেই দিনের বেলায় গাছের নিকট হইতে আমরা অক্সিজেনই পাই। রাত্রিতে কিন্তু ঠিক উল্টা। তখন খাদ্যের কারখানা থাকে বন্ধ এবং আমরা গাছের নিকট হইতে পাই শুধু অঙ্গারাম্ল।

(৩) **শরীর হইতে জল ত্যাগ করা**—শরীরের জন্য যতখানি জল দরকার, আমরা অনেক সময় তাহা অপেক্ষা বেশি পরিমাণ জল পান করি এবং এই বাড়তি জলটুকু মূত্র ও ঘামরূপে শরীর হইতে ত্যাগ করিয়া থাকি। গাছেরাও অনেকটা এইরূপ করিয়া থাকে। সবুজ পাতার মধ্যে খাবার তৈয়ারী করিবার জন্য যতখানি প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা কিছ বেশি পরিমাণ জল তাহারা মাটি হইতে সংগ্রহ করে, এই বাড়তি জলটুকু পরে সবুজ পাতার ফুটার মধ্য দিয়া বাষ্পাকারে ত্যাগ করিয়া থাকে। এই কাজকে বলা হয় **প্রস্বেদন**।

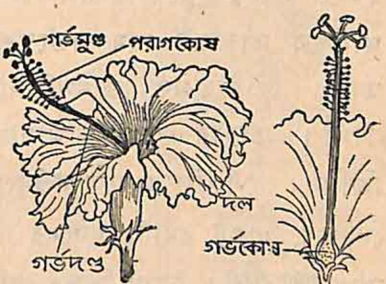
ফুল

(ক) **ফুলের কাজ**—সাধারণ গাছের বেলায় তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ, ফুল হইতে ফল হয় এবং ফলের মধ্যে যে-বীজ থাকে সেই বীজ হইতে নূতন গাছের জন্ম হয়। তবেই বুঝা

যাইতেছে যে, ফুল যদি না থাকিত তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত নূতন গাছের জন্ম হইত না। অর্থাৎ গাছের বংশ-রক্ষা হইত না। অতএব ফুলের প্রধান কাজ হইল গাছের বংশ-রক্ষা করা। এই কাজ ঠিক কি ভাবে চলে, তাহার আরো পরিচয় পরে পাইবে। অপাতত দেখা যাক, সাধারণ ফুলের গড়নটা কিরূপ হয়।

(ক) **ফুলের গড়ন**—সাধারণ একটি ফুলের প্রধানত চারটি অংশ—

(১) **বৃতি**—বোঁটার পরেই ফুলের প্রথম অংশের নাম **বৃতি**। বৃতি কাহাকে বলে? বাগান হইতে একটি বোঁটা-সুদ্ধ ফুল তুলিয়া আন। দেখিবে, বোঁটার ঠিক উপরে এবং পাপড়িগুলির নীচে ফুলটির এক সবুজ অংশ আছে। ইহারই নাম বৃতি। ফুলটি যতদিন কুঁড়ি অবস্থায় ছিল, ততদিন এই বৃতিই ছিল কুঁড়ির উপরকার আবরণ। বৃতির অংশগুলিকে **বৃত্যংশ** বলে।



জবা ফুলের বিভিন্ন অংশ

(২) **দল**—বৃতির পর ফুলের দল এবং এই দলেরই এক একটি অংশকে **পাপড়ি** বলা হয়। অবশ্য সব ফুলের পাপড়িই এক রকমের নয়। কোন ফুলের বেলায় সেগুলি একসঙ্গে জোড়া থাকে; কোন ফুলের বেলায় সেগুলি থাকে আলাদা।

(৩) **পরাগকেশর**—ফুলটিকে লইয়া ভাল করিয়া নজর করিলে দেখিতে পাইবে, তাহার পাপড়ি-ঘেরা জায়গাটুকুর ভিতর একটি সরু ডাঁটার মত জিনিস রহিয়াছে। পাপড়িগুলি সরাইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখ, ডাঁটার চারিদিকে অনেকগুলি সরু সূতার মত জিনিস রহিয়াছে এবং প্রত্যেকটি সূতার মাথায় একটি করিয়া ছোট থলি আছে। ইহাদের নাম **পরাগকেশর** বা **পুংকেশর**। ইহার সূতার মত অংশের নাম **সূত্র** এবং মাথার থলিটির নাম **পরাগ কোষ**। এই পরাগ কোষের মধ্যেই থাকে হলুদ রঙের গুঁড়ি গুঁড়ি **পরাগ** বা **রেণু**।

(৪) **গর্ভকেশর**—এইবার সরু ডাঁটির মত জিনিসটি হইতে সযত্নে পুংকেশরগুলি খসাইয়া ফেল। যাহা বাকী থাকিবে তাহারই নাম গর্ভকেশর। গর্ভকেশরের তিনটি ভাগ। ডাঁটার মত জিনিসটি নাম **গর্ভদণ্ড**; ইহার ভিতরটা ফাঁপা। তাহার একেবারে মাথায় কয়েকটি ডুমা ডুমা ধরনের জিনিস। সেগুলিকে বলে **গর্ভমুণ্ড**। একেবারে নীচের দিকে দেখিবে, একটু মোটা ধরনের অংশ রহিয়াছে। তাহার নাম **গর্ভকোষ**। ইহার ভিতর ছোট ছোট **ডিম্বকোষ** থাকে।

কয়েকটি সাধারণ ফুল—ফুলের গড়ন আরো ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য জবা, অপরাজিতা ও ধুতুরা ফুল আলাদা করিয়া দেখা যাক—

১। **জবা ফুল**—জবা ফুলকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে, উহার সবুজ বৃতির পাঁচটি বৃত্যাংশ এক সঙ্গে জোড়া এবং উহার নীচে **উপবৃতি** নামে আরও এক রকম

জিনিস রহিয়াছে। এই উপবৃতিগুলি সংখ্যায় পাঁচটি বা ছয়টি। ইহার দল-এর মধ্যে আছে পাঁচটি টকটকে লাল পাপড়ি। জবাফুলে অনেকগুলি পুংকেশর আছে। কিন্তু উহাদের সূত্রগুলি নীচের দিকে এক সঙ্গে জোড়া লাগিয়া গর্ভকেশরকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। ইহার গর্ভকেশর মাত্র একটি, কিন্তু দণ্ডের উপর পাঁচটি গর্ভমুণ্ড। ইহার গর্ভকোষকে যদি আড়াআড়ি ভাবে কাটিয়া ফেল তাহা হইলে তাহার মধ্যেও পাঁচটি গর্ভকোষ চোখে পড়িবে।

২। **অপরাজিতা ফুল**—এইবার একটি অপরাজিতা ফুল সংগ্রহ করিয়া আন। দেখ জবাফুলের সহিত তাহার তফাৎ কোথায়। দেখিতে পাইবে, অপরাজিতা ফুলের বৃতিরও পাঁচটি অংশ। কিন্তু তাহার নীচে যে উপবৃতি আছে সেই উপবৃতির সংখ্যা মাত্র দুইটি। অপরাজিতার পাপড়ির রং নীল (অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে সাদাও হইতে পারে) এবং সংখ্যা পাঁচ; পাঁচটি পাপড়িই আলাদা আলাদা ভাবে রহিয়াছে।

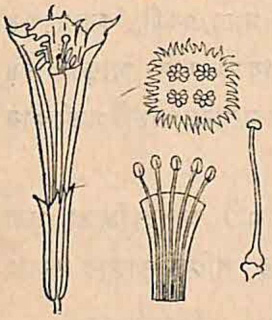


অপরাজিতা ফুল

শুধু আলাদা নহে, তাহাদের সাজাইবার গড়নও অন্য ধরনের: একটি পাপড়ির ভিতর আর একটি রহিয়াছে; এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বাইরের পাপড়িটি আকারে সবচেয়ে বড়। পাপড়ির ভিতর দশটি পুংকেশর, উহাদের মধ্যে নয়টি

একসঙ্গে জোড়া এবং একটি আলাদা। পুংকেশরের পর একটি গর্ভকেশর, গর্ভদণ্ডের মাথায় মাত্র একটি গর্ভমুণ্ড। গর্ভকোষটি লম্বা ও চ্যাপ্টা।

৩। **ধুতুরা ফুল**—জবাফুলের মতই ধুতুরা ফুলের পাঁচটি সবুজ বৃত্যাংশ একসঙ্গে জোড়া। দলে পাঁচটি সাদা পাপড়ি এবং উহারাও একসঙ্গে জোড়া। ধুতুরা ফুলের পুংকেশরও পাঁচটি, ইহারা পাঁপড়ির গায়ে লাগান। মাঝখানে একটি গর্ভকেশর এবং তাহার মাথায় মাত্র একটি গর্ভমুণ্ড। গর্ভকোষটিকে আড়াআড়ি ভাবে কাটিলে উহাতে চারটি ডিম্বকোষ দেখা যাইবে।



ধুতুরা ফুল

ফুল-সংগ্রহ ও ফুলের বই—দেখিতে পাইতেছ, ফুল নানা রকমের হয়। তাই বিভিন্ন প্রকারের ফুল সংগ্রহ করা এবং একটি খাতায় তাহাদের বৈচিত্র্যের কথা লিখিয়া রাখা খুবই চিত্তাকর্ষক হইবে। কিন্তু ফুল তুলিয়া রাখিতে গেলে তাহা শুকাইয়া একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। কি ভাবে তাহাদের ভাল অবস্থায় রাখা সম্ভব? সেই উদ্দেশ্যে দুইটি বড় ব্লটিং কাগজ যোগাড় কর। একটি ব্লটিং কাগজ বিছাইয়া তাহার উপর ফুলগুলিকে মেলিয়া দাও এবং অপর ব্লটিং কাগজ দিয়া সেগুলি চাপা দাও। তারপর তাহার উপর একটি কাঁচের টুকরা চাপাইয়া দাও। দেখিবে, ব্লটিং কাগজ

পাপড়ির রস শুষিয়া লইয়াছে, কিন্তু ফুলগুলি তেমন নষ্ট হয় নাই।

একটি মোটা খাতাও সংগ্রহ করিবে। তাহার বাঁ দিকের পাতায় একটি ফুল আটকাইয়া দাও এবং ডান দিকের পাতায় লিখিয়া রাখ সেই ফুলের বৈশিষ্ট্য। এইভাবে নানা প্রকার ফুল সংগ্রহ করিয়া তাহাদের বৈশিষ্ট্যের কথা লিখিয়া যাইতে হইবে।

পরাগ-মিলন—ফুল হইতে ফল হয়। কিন্তু কি ভাবে? প্রজাপতি, মৌমাছি প্রভৃতি নানা কীটপতঙ্গ ফুলের মধু সংগ্রহ করিবার জন্য ফুলের উপর গিয়া বসে। তখন তাহাদের গায়ে ফুলের রেণু লাগিয়া যায়। তারপর, তাহাদের গায়ের রেণু সেই ফুলেরই গর্ভমুণ্ডে লাগিয়া যায়; অথবা তাহারা যখন সেই ফুল ছাড়িয়া সেই জাতীয় অন্য একটফুলের উপর উড়িয়া গিয়া বসে, তখন ঐ রেণু সেই নূতন ফুলের গর্ভমুণ্ডে লাগিয়া যায়। এই ঘটনাটিকে বলে পরাগ-মিলন। পরাগ-মিলনের ফলে গর্ভকোষটি ক্রমশ বড় হইতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তাহাই ফলে পরিণত হয়। গর্ভকোষের ভিতর যে ডিম্বকোষ থাকে তাহা বীজে পরিণত হয়। একটি কথা মনে রাখিও, এক জাতীয় ফুল ছাড়া পরাগ-মিলন হয় না।

বৃক্ষ ও শাখা-বিন্যাস

যে সব গাছের কাণ্ড শক্ত সেগুলিকে সাধারণভাবে বৃক্ষ বলে। আম, জাম, কদম্ব, বট প্রভৃতি বৃক্ষ। ইহাদের কাণ্ডের গোড়ার দিকে শাখা বা পাতা প্রায় থাকেই না, কিছু উপর হইতে চারিদিকে শাখা-প্রশাখা বা ডালপালা ছড়াইয়া পড়ে।

শাখার একটি কাজ হইল সবুজ পাতাগুলিকে এমনভাবে মেলিয়া ধরা যাহাতে উহারা প্রচুর সূর্যালোক পাইতে পারে। এক এক গাছের শাখা এক এক রকমে বিস্তার লাভ করে। ইহাই শাখা-বিন্যাস। কোন কাণ্ডের ডগা দুই শাখায় ভাগ হইয়া দুই দিকে ছড়াইয়া পড়ে, প্রত্যেক শাখাও দুই ভাগে ভাগ হইয়া যায়। আবার কোন কোন গাছের প্রধান কাণ্ডের ডগা উপর দিকে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কক্ষ-মুকুল হইতে চারিদিকেও শাখা বাড়িতে থাকে। একই পাব হইতে দুই দিকে দুইটি শাখা হইতে পারে অথবা এক পাবে যে-দিকে একটি শাখা হয় পরবর্তী পাবে উহার বিপরীত দিকে একটি করিয়া শাখা বাহির হইতে পারে।

শাখা-পর্যবেক্ষণ—বিভিন্ন গাছের কয়েকটি ছোট ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া আনিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ। দেখিবে শাখা-বিন্যাসের যেরূপ কয়েকটি নিয়ম আছে পাতার বিন্যাসের নিয়মও অনেকটা সেইরূপ। পেয়ারা, তুলসী বা আকন্দ গাছের ডালে একই পাবে দুইটি করিয়া পাতা পাইবে, আবার চাঁপা বা আতা গাছের ডালে এক এক পাবে বিপরীত দিকে একটি করিয়া পাতা দেখিবে।

ত্বক—গাছের কাণ্ড এবং শাখা-প্রশাখার বাহিরের অংশটির নাম ত্বক। গাছ যত দিন কচি থাকে ততদিন এই ত্বকও নরম থাকে। বড় বড় গাছের বেলায় ত্বক ক্রমশ কঠিন হইয়া যায়। ত্বকের কাজ হইল আলো-বাতাস হইতে কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখার ভিতরকার শিরা-উপশিরাগুলিকে বাঁচাইয়া রাখা। বিভিন্ন গাছের ত্বক বিভিন্ন রকমের। সুপারী, ইউক্যালিপ্‌টাস প্রভৃতির ত্বক মসৃণ, আম-জাম-এর ত্বক এবড়ো-থেবড়ো।

এই সব গাছের নানা ধরনের ত্বক আমাদের নানা উপকারে আসে। পাট, শণ প্রভৃতি গাছ জলে পচাইয়া তাহাদের পাতলা ত্বক আলাদা করিয়া লওয়া হয়; সেই ত্বক হইতে আমরা পাট, শণ প্রভৃতি পাইয়া থাকি। অশোক, সিঙ্কোনা প্রভৃতির ত্বক হইতে আমরা উপকারী ঔষধ পাই।

শাখা-মুকুল—কাণ্ড বা শাখার ডগায় শীর্ষ-মুকুল এবং গায়ে পাতার কোলে কক্ষ-মুকুলের কথা পড়িয়াছ। যে-সব মুকুল বাড়িয়া শাখায় পরিণত হয় সেগুলিকে শাখা-মুকুল বলে (যে-সব মুকুল হইতে ফুল হয় তাহাদের বলে ফুলের কুঁড়ি)। শাখা-মুকুল আসলে পাতার আবরণে ঢাকা এক একটি শাখার কচি বা শিশু অবস্থা। ইহার মধ্যে পাব, পাতা, কক্ষ-মুকুল ও শীর্ষ-মুকুল সবই অতি ছোট আকারে লুকাইয়া থাকে। একটি শাখা-মুকুলের উপরের পাতার আবরণ সাবধানে খসাইয়া পরীক্ষা করিলে এই সব দেখা যায়। একটি ছোট গাছের শাখামুকুলকে ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাইবে কিরূপে একটির পর একটি পাতার আবরণ সরাইয়া শাখা ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে।


জলের মধ্যে ডাল

জলে শাখার পরিবর্তন—গাছের একটি ছোট ডাল কাটিয়া উহার কাটা দিকটা এক গ্লাস জলে ডুবাইয়া রাখ। দেখিবে, ডালটি কিছুদিন সতেজ থাকিবে। ডালে কুঁড়ি থাকিলে ফুলও ফুটিবে, শাখা-মুকুল থাকিলে উহাও একটু বড় হইবে।

তারপর ধীরে ধীরে পাতা ও মুকুলগুলি শুকাইয়া ডালটি মরিয়া যাইবে। এরূপ কেন হয়? ডালটি কাটিবার সময় যেটুকু খাবার উহাতে ছিল তাহা উহাকে কিছু সময় বাঁচাইয়া রাখে। গ্লাসের জল ডালের শিরা-উপশিরা দিয়া পাতায় যায় এবং সেখানে সূর্যের আলোকে কিছু খাবারও তৈয়ারী হয়—ইহাতেও ডালটি কিছু সময় বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু মাটি হইতে শিকড় যে-সব রস সংগ্রহ করিত তাহা তো এখন আর পাওয়া যাইতেছে না, তাই কিছুদিন পর খাদ্যের অভাবে ডালটি মরিয়া যায়।


লাল জলে কচুপাতা

গ্লাসের জল যে ডালের শিরার ভিতর দিয়া পাতায় যায় তাহা সহজেই পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়। গ্লাসের জলে সামান্য লাল কালি গুলিয়া জল লাল করিয়া দাও। তারপর ডগাশুদ্ধ একটি কচুপাতা কাটিয়া আনিয়া জলের মধ্যে কাটা অংশ ডুবাইয়া রাখ। কিছুক্ষণ পরে ডগাটি তুলিয়া চিরিয়া ফেল। দেখিবে, গ্লাসের লাল জল লম্বা লম্বা শিরার মধ্য দিয়া পাতা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

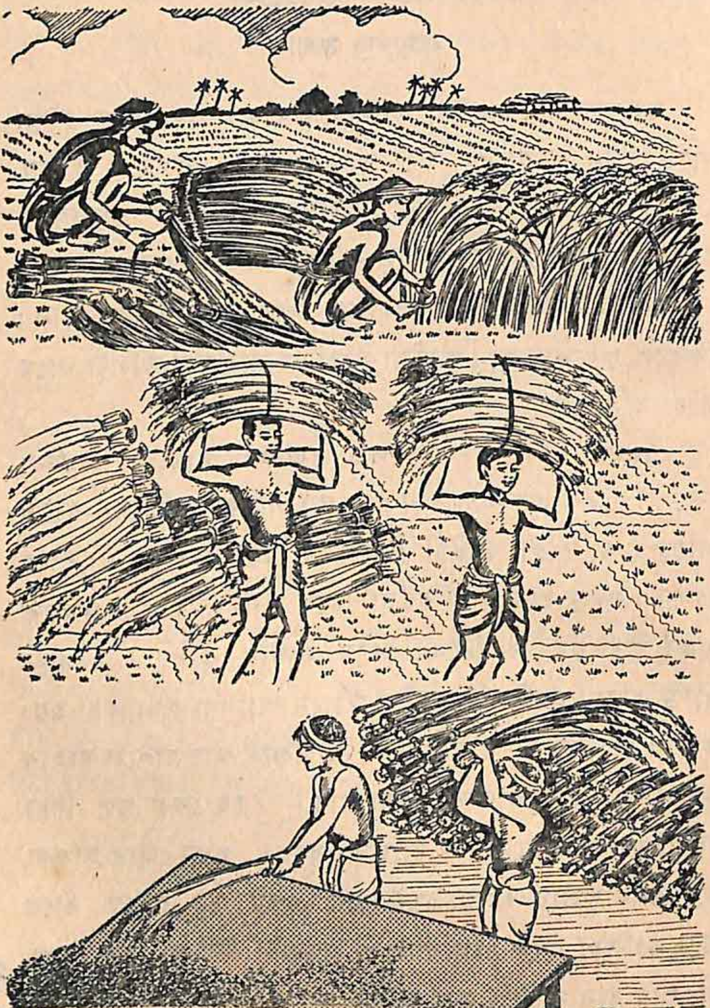
ফসলের কথা

ফসলের দিন ঘনাইয়া আসিলে কৃষকেরা বড় ব্যস্ত হইয়া পড়ে তখন তাহাদের কত কাজ! ফসল কাটিতে হইবে, ক্ষেত হইতে বাড়িতে আনিতে হইবে, গাছ হইতে ছাড়াইতে হইবে, তারপর শুকাইয়া ভাল করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে।

ধান কাটা ও ঝাড়া –আমাদের দেশের প্রধান ফসল ধান। কিরূপে কৃষকেরা ধান কাটিয়া সারা বছরের জন্য তুলিয়া রাখে তাহা বলিতেছি।

প্রথমত, ধান পাকিবার পর কৃষকেরা ধানগাছ কাটিয়া ফেলে। এক এক মুঠা ধান বাঁ হাতে ধরিয়া চাষী ডান হাতে কাস্তে দিয়া তাহা কাটিয়া পাশে রাখিয়া দেয়। এইভাবে ক্ষেতের সমস্ত ধান কাটা হইয়া গেলে আঁটি বাঁধিয়া সেগুলিকে একত্র করা হয় এবং দিনের শেষে মাথায় করিয়া বা গরুর গাড়ি করিয়া আঁটিগুলি বাড়ীর উঠানে আনিয়া জমা করা হয়। তাহার পর কাঠের পাটার উপর আঁটিগুলি আছড়াইলে তাহার ডগা হইতে ধান আলাদা হইয়া যায়। কেহ কেহ গরু দিয়া মাড়াইয়া খড় হইতে ধান আলাদা করে। যখন জোর হাওয়া বহে তখন কুলায় করিয়া সেই ধান একটু উঁচু হইতে ধীরে ধীরে ঢালিয়া দিলে ধূলা-বালি ও খড়কুটা উড়িয়া যায় এবং পরিষ্কার ধান মাটিতে জমা হইতে থাকে। তারপর সেই ধান দুই এক দিন রোদে শুকাইয়া বস্তায় পুরিয়া বাড়িতে উঠাইয়া রাখা, কিংবা গোলায় তুলিয়া রাখার ব্যবস্থা করিতে হয়।

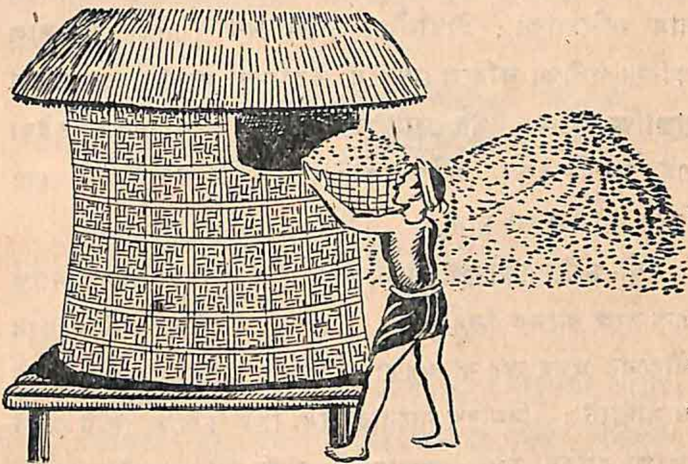
ধানের গোলা-- গোলা বা মরাই নানা রকমের হয়।



ধান কাটা ও ঝাড়া

এগুলি দেখিতে বড় সুন্দর—আকারে চৌকোণা বা গোল।

উপরে টিন বা খড়ের চাল, বাঁশের বা চাটাইয়ের বেড়া ভিতর দিকে গোবর-মাটি দিয়া লেপা। কোন দরজা নাই, উপর দিকে ছোট একটিমাত্র জানালা। মাটি হইতে প্রায় দুই হাত উঁচু কাঠ বা বাঁশের মাচার উপর চাটাই পাতিয়া তাহার উপরে



ধানের গোলা

মরাই তৈয়ারী হয়। ইহাতে ধান স্যাঁতসেতে হইতে পারে না, ইঁদুরেও নষ্ট করিতে পারে না।

অন্যান্য ফসল – আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ধান ছাড়া সরিষা, মটর, ছোলা, তিল, কলাই প্রভৃতিরও চাষ হয়। এই সব ফসল পাকিলে ধানের মতই গাছ কাটিয়া, তক্তায় আছড়াইয়া কুলায় বাছিয়া ও তারপরে বস্তায় বা গোলায় পুরিয়া সংরক্ষণ করিতে হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

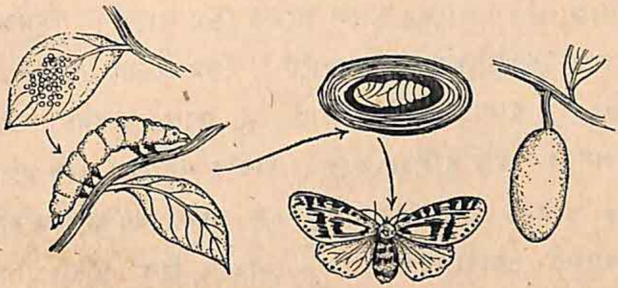
কীট-পতঙ্গ ও ব্যাঙ-এর কথা

১। **গুটিপোকা**— রাত্রে একরকম পতঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের চেহারা অনেকটা প্রজাপতির মত। ইহাদের নাম গুটিপোকা ; ইংরাজীতে বলে **মথ** (moth)। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিবে, ইহাদের মাথায় একজোড়া **পুঞ্জাক্ষি** থাকে। খুব ছোট অনেকগুলি চোখ একত্র হইয়া এই পুঞ্জাক্ষি হয়। গুটিপোকার বুকে তিন জোড়া পা এবং পিঠে দুই জোড়া ডানা।

স্ত্রী-গুটিপোকা কুল, শাল, মুগা, তুঁত, পলাশ প্রভৃতি গাছে এক সঙ্গে অনেক ডিম পাড়ে। এই ডিম হইল গুটিপোকার জীবনের প্রথম স্তর বা অবস্থা। ডিম পোস্তদানার মত ছোট ও সাদাটে। দিন দশ-বারোর মধ্যে ডিম হইতে ছোট ছোট পোকা বাহির হয় ; সেগুলিকে **লার্ভা** বা শূককীট বলে। ইহাই হইল গুটিপোকার জীবনের দ্বিতীয় অবস্থা। লার্ভা পাতা খায় এবং বারকতক খোলস বদল করে। তারপর তাহারা নিজ দেহ খানিকটা গুটাইয়া লয় এবং মুখের লালা দিয়া দেহ ঘিরিয়া একটি করিয়া গুটি বোনে। গুটিগুলি দেখিতে অনেকটা পাতিলেবুর মত। গুটির ভিতরে থাকিবার সময় গুটিপোকার যে-অবস্থা তাহাকে **পিউপা** বা মূককীট বলে। ইহা গুটিপোকার জীবনের তৃতীয় অবস্থা। কিছুদিন পরে ঐ গুটি কাটিয়া ভিতরকার **গুটিপোকা** বাহির হইয়া পড়ে। ইহা তাহাদের জীবনের চতুর্থ বা পূর্ণাঙ্গ অবস্থা। অতএব

দেখা যাইতেছে, গুটিপোকার জীবনে মোট চারিটি অবস্থা—(১) ডিম (২) লাভা (৩) পিউপা (৪) পূর্ণাঙ্গ গুটিপোকা

গুটিপোকা আমাদের খুবই উপকারে আসে। কেননা, তাহারা যে গুটি বোনে, তাহা হইতে আমরা এণ্ডি, মুগা, গরদ, তসর প্রভৃতি নানাবিধ রেশমের সূতা পাইয়া থাকি।



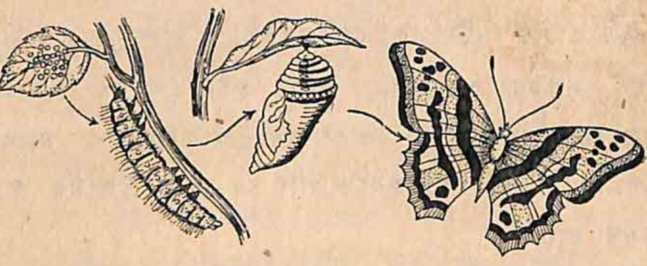
গুটিপোকা

গুটি কাটিয়া গুটিপোকা বাহির হইয়া পড়িলে সূতাও কাটিয়া যায়; সেইজন্য গুটিপোকা বাহির হইবার পূর্বেই গুটিগুলি গরমজলে সিদ্ধ করিয়া ভিতরকার পোকাগুলিকে মারিয়া ফেলা হয়। প্রতি গুটি হইতে প্রায় ৪৫০ গজ রেশমের সূতা পাওয়া যায়।

২। **প্রজাপতি**—প্রজাপতি দিনের বেলায় দেখা যায়। একটি প্রজাপতি ধরিয়া যদি ভাল করিয়া পরীক্ষা কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তাহার শরীর প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত—মাথা, বুক ও পেট। গুটিপোকার মত ইহারও একজোড়া পুঞ্জাক্ষি এবং একজোড়া শুঁড় থাকে। ইহা ছাড়া তাহার মুখে থাকে একটি ফাঁপা নল। নলটি গুটানো অবস্থায় থাকে; মধু সংগ্রহ করিবার সময় প্রজাপতি উহার পাক

খুলিয়া লম্বা করিয়া লয়। গুটিপোকার মত প্রজাপতির বুকেও তিনজোড়া পা ; কিন্তু ডানা মাত্র একজোড়া। সেই ডানাজোড়া নানা রঙে অতি চমৎকার দেখায়।

গুটিপোকার মত প্রজাপতির জীবনেও চারিটি স্তর— ডিম, লার্ভা, পিউপা ও পূর্ণাঙ্গ অবস্থা। গুটিপোকার মত স্ত্রী-প্রজাপতিও গাছের ডালে অনেক ডিম পাড়ে। ডিমগুলি দেখিতে একটু বড় এবং সাদাটে। ডিম ফুটিয়া বাহির হয় লার্ভা—তাহারা এমনই ক্ষুধার্ত যে, জন্মের পরই ডিমের খোলসটুকু পর্যন্ত খাইয়া ফেলে ; তাহার পর শুরু করে গাছের পাতা খাইতে। যতদিন পর্যন্ত এই লার্ভা অবস্থা, ততদিন তাহাদের চেহারা বিশ্রী থাকে—দেখিতে ঠিক শুঁয়াপোকার



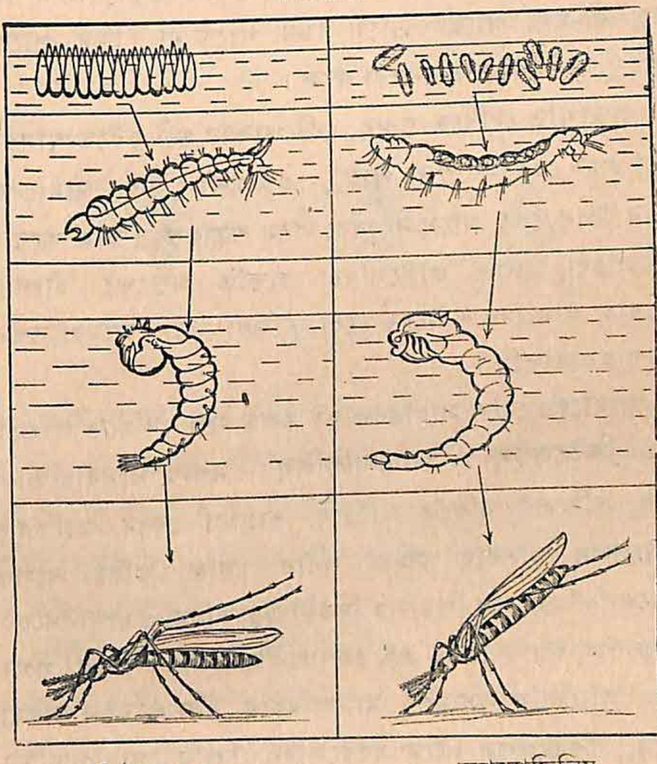
প্রজাপতি

মত। বার কয়েক খোলস বদলাইবার পর ইহারা মুখের লালা দিয়া দেহের চারিদিকে গুটি তৈয়ারী করে। গুটির ভিতর তাহাদের এই যে-অবস্থা, ইহার নাম পিউপা। কিছুদিন পরে গুটি কাটিয়া বাহির হয় সুন্দর প্রজাপতি। কিন্তু দেখিতে যত সুন্দরই হোক, প্রজাপতি গুটিপোকার মত

আমাদের উপকারে আসে না। প্রজাপতির গুটি কোন কাজে লাগে না।

৩। **মশা**—গুটিপোকা ও প্রজাপতির তুলনায় মশা অনেক ছোট বটে কিন্তু উহাও পতঙ্গ বিশেষ। ইহার মাথায়ও

মশার রূপান্তর



কিউলেক্স্ অ্যানোফিলিস্

একজোড়া শুঁড়, মাথার সামনে একটি নল। স্ত্রী-মশার নলটি খুব তীক্ষ্ণ, পুরুষ মশার নল ভোঁতা। তাই পুরুষ-মশা

আমাদের রক্ত শুষিয়া লইতে পারে না, কেবলমাত্র স্ত্রী-মশাই পারে। মশারও তিনজোড়া পা, একজোড়া ডানা এবং পেট নয় খণ্ডে বিভক্ত।

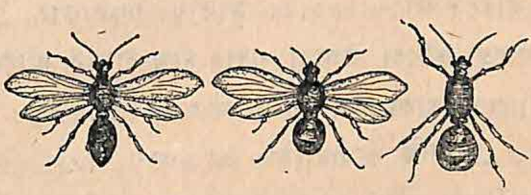
গুটিপোকা ও প্রজাপতির ন্যায় মশার জীবনেরও চারি অবস্থা—(১) ডিম (২) লার্ভা (৩) পিউপা ও (৪) পূর্ণাঙ্গ মশা। কিন্তু স্ত্রী-মশা গাছের ডালে ডিম পাড়ে না, ডিম পাড়ে পুকুর, ডোবা প্রভৃতি নোংরা জলে।

প্রজাপতি দেখিতে সুন্দর, গুটিপোকার গুটি হইতে আমরা নানা রকম রেশমের সূতা পাই ; কিন্তু মশা ? উহা আমাদের কোন উপকারেই আসে না, বরং পরম শত্রুর ন্যায় কাজ করে। ম্যালেরিয়া, গোদ, ফাইলেরিয়া প্রভৃতি অসুখের বীজাণু মশারাই আমাদের শরীরের মধ্যে ফুঁড়িয়া দেয় ; আমরা তখন অসুস্থ হইয়া পড়ি।

আমাদের দেশে সাধারণত দুই রকম মশা দেখিতে পাওয়া যায়—**কিউলেক্স্ ও অ্যানোফিলিস্**। মশার বসিবার ভঙ্গি নজর করিলেই বুঝিতে পারিবে, তাহারা কোন্ জাতির। কিউলেক্স বসিবার সময় শরীর সোজা করিয়া বসে। অ্যানোফিলিস্ বসে পিছনের দিকটা উঁচু করিয়া ও মাথা নিচের দিকে বাঁকাইয়া। চিত্রে এই দুই প্রকার মশার পার্থক্য লক্ষ্য কর। অ্যানোফিলিস্ মশা ম্যালেরিয়ার বীজাণু বহন করিয়া আনে ; কিউলেক্স্ আনে ফাইলেরিয়া, ক্রিমি, গোদ প্রভৃতির বীজাণু।

৪। **পিপীলিকা**—পিপীলিকার দেহ, মাথা, বুক ও পেট এই তিনটি অংশ। তাহার মাথায় একজোড়া পুঞ্জাক্ষি ও

একজোড়া শুঁড় থাকে ; বুকে তিনজোড়া পা। পুরুষ এবং স্ত্রী পিপীলিকার দুইজোড়া করিয়া ডানাও থাকে। সাধারণত ইহারা বাসার মধ্যেই থাকে বলিয়া আমাদের চোখে পড়ে না। পুরুষের তুলনায় স্ত্রী-পিপীলিকার শরীর অনেক বড়। স্ত্রী এবং পুরুষ ছাড়াও তাহাদের মধ্যে আরও দুই রকম পিপীলিকা থাকে—এক রকমকে বলা হয় শ্রমিক এবং আর এক রকমকে বলা হয় সৈনিক। শ্রমিক-পিপীলিকারা চারিদিক ঘুরিয়া



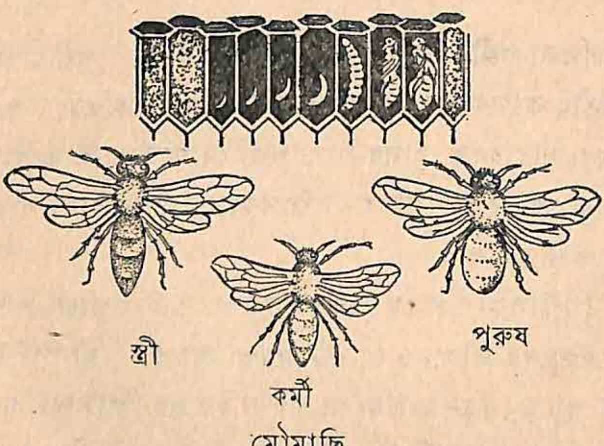
পিপীলিকা

পিপীলিকা-পল্লীর জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে। পল্লীর অন্যান্য যাবতীয় কাজকর্মের প্রায় সমস্তই ইহারা করিয়া থাকে। আমরা সাধারণত যে-সব পিপীলিকা দেখিতে পাই তাহা এই শ্রমিক শ্রেণীর। সৈনিক-পিপীলিকাদের উপর বাসা পাহারা, যুদ্ধ প্রভৃতির ভার।

পিপীলিকাও পতঙ্গশ্রেণীর প্রাণী। তাই অন্যান্য পতঙ্গের মত ইহাদের জীবনেও চারিটি অবস্থা আছে। স্ত্রী-পিপীলিকা ডিম পাড়ে ; ডিম ফাটিয়া লার্ভা বাহির হয়। লার্ভারা কিছুদিন পরে মুখের লালা দিয়া শরীরের চারিপাশে গুটি বোনে—গুটির ভিতর তাহাদের যে অবস্থা, তাহার নাম পিউপা। শেষ পর্যন্ত গুটি ভেদ করিয়া বাহির হয় পূর্ণাঙ্গ পিপীলিকা।

পিপীলিকার কাজকর্ম দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। যে-পল্লীর মধ্যে ইহারা বাস করে তাহার নির্মাণ-কৌশল অতি বিস্ময়কর। তাহা ছাড়াও নানা প্রকার অদ্ভুত কাজ ইহারা করিয়া থাকে। আমরা যেরূপ দুধ পাইবার জন্য গরু পুষি, ইহারাও সেইরূপ একপ্রকার পোকা ধরিয়া আনে এবং পল্লীর মধ্যে আটকাইয়া রাখে। এই পোকার গায়ে সুড়সুড়ি দিলে শরীর হইতে দুধের মত রস বাহির হয়। ইহারা ভূমি চাষের কাজও করিতে জানে। ছাতা জাতীয় একপ্রকার উদ্ভিদের বীজ সংগ্রহ করিয়া ইহারা বর্ষার মুখে বাসার আশেপাশে ছড়াইয়া দেয়, তাহা হইতে উহাদের খাদ্য উৎপন্ন হয়।

৫। **মৌমাছি** – মৌমাছিও একপ্রকার পতঙ্গ। ইহাদের পাঁচটি করিয়া চোখ—মাথার দুইপাশে দুইটি পুঞ্জাক্ষি এবং



মৌমাছি

সামনে তিনটি ছোট চোখ ; তাহা ছাড়া মাথায় এক জোড়া শুঁড় থাকে। ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করিবার জন্য ইহারা মুখের সম্মুখ

দিক্‌কার লোম বা শুঁড়জাতীয় অন্য অঙ্গ ব্যবহার করে। ইহাদের বুকে তিনজোড়া পা ও দুই জোড়া ডানা থাকে।

বাস করিবার জন্য ইহারা যে জিনিস তৈয়ার করে, তাহার নাম মৌচাক। মৌচাকের নির্মাণ-কৌশলও বিস্ময়কর। এই মৌচাকের মধ্যে উহারা মধু জমা করে; আমরা মৌচাক হইতে সেই মধু সংগ্রহ করিয়া থাকি।

মৌচাকের মধ্যে অনেক মৌমাছি থাকে। অধিকাংশই হইল কর্মী-মৌমাছি। সমস্ত রকম কাজকর্মের ভার প্রধানত ইহাদের উপর। ইহারা ছাড়াও মৌচাকের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ মৌমাছি থাকে। সাধারণত একটি মৌচাকে একটির বেশী স্ত্রী-মৌমাছি থাকে না। স্ত্রী-মৌমাছিকে বলা হয় মক্ষিরাণী। আকারে তাহারাই সব চাইতে বড়। কর্মী-মৌমাছিদের মত তাহাদেরও হুল থাকে। পুরুষ-মৌমাছির চেহারা মোটা; তাহাদের হুল থাকে না।

অন্যান্য পতঙ্গের ন্যায় মৌমাছিদের জীবন-ইতিহাসেও চারটি স্তর—ডিম, লার্ভা, পিউপা ও পূর্ণাঙ্গ মৌমাছি। স্ত্রী-মৌমাছি ডিম পাড়ে, ডিম ফুটিয়া বাহির হয় লার্ভা, পরে লার্ভারা লালা দিয়া গুটি বোনে ও তাহার মধ্যে থাকে। এই অবস্থায় তাহাদের বলে পিউপা। শেষ পর্যন্ত গুটি ভেদ করিয়া পিউপারা পূর্ণাঙ্গ মৌমাছির আকারে বাহির হয়।

৬। **ব্যাঙ**—এতক্ষণ কয়েক রকম পতঙ্গের কথা বলিলাম। এইবার বলিব এমন প্রাণীর কথা, যাহারা কীট-পতঙ্গ খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। এইদলের একটি প্রাণী হইল ব্যাঙ। ব্যাঙের জিভ লম্বা; তাহার আগার দিকটা মুখের মধ্যে আটকানো।

কীট-পতঙ্গ সামনে পাইলে ব্যাঙ ঐ লম্বা জিভ উল্টাইয়া বাহির করিয়া দেয়। জিভের গা চটচটে, তাহাতে কীট-পতঙ্গ আটকাইয়া যায়। ব্যাঙের খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে আর একটা মজার কথা—তাহারা জল পান করে না এবং শীতকালে কিছুই খায় না। জল তাহাদের চামড়ার ছিদ্র দিয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। শরীরের জন্য জলের যে প্রয়োজন তাহা এই ভাবেই মিটিয়া যায়।

ব্যাঙের চেহারাও বড় অদ্ভুত। ঘাড় বলিয়া কিছু নাই—মাথা ও ধড় যেন এক হইয়া গিয়াছে। ইহাদের কানের উপর একটি পাতলা চামড়ার ঢাকা রহিয়াছে; কান কোথায় আছে তাহা বাহির করা কঠিন। মাথার উপর একজোড়া বড় বড় চোখ; দুই জোড়া পায়ের মধ্যে সামনের জোড়া ছোট, পিছনের জোড়া অনেক বড়। সামনের পায়ে চারিটি করিয়া আঙুল, পিছনের পায়ে পাঁচটি করিয়া।

বাংলা দেশে রকমারি ব্যাঙ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে প্রধান হইল দুই প্রকার: সোনা ব্যাঙ ও কুনো ব্যাঙ। বৃষ্টির পর যে ব্যাঙের ডাক শুনিতে পাও, তাহা সোনা ব্যাঙের ডাক; মাঠে গিয়া সেই ব্যাঙ ধরিলে দেখিবে তাহার পেটের রং হলুদ, গা মসৃণ। কুনো ব্যাঙ দেখিতে বিশ্রী; ছাই রং-এর গায়ের সর্বত্র কালো ডুমো-ডুমো বিষগ্রন্থি থাকে। ইহারা নর্দমা, গর্ত প্রভৃতি জায়গায় বাস করে।

এইবার ব্যাঙ-এর জন্ম ও জীবনের ইতিহাস বলিতেছি। স্ত্রী-ব্যাঙ বর্ষাকালে জলে ডিম পাড়ে। ডিমগুলি নরম। ক্রমশ অনেক ডিম একত্র হয় এবং তাহার পর তাহা হইতে বাহির হয়

ব্যাঙাচি। ব্যাঙাচির মুখ নাই ; শরীর বলিতে মাথা ও লেজ। মুখ না থাকিলে খাওয়া দাওয়া কি করিয়া সম্ভব ? প্রথম অবস্থায় তাহারা কিছুই খায় না। তারপর খানিক বড় হইবার পরে ইহাদের মুখ হয় এবং পা গজায়। তখন তাহারা জলের পোকা মাকড় খাইতে শুরু করে। ব্যাঙাচিদের ফুসফুস বলিয়া কিছু থাকে না। শরীরের মধ্যে ফুসফুসের বদলে থাকে মাছের মত ফুলকা ; তাহারই সাহায্যে তাহারা শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায়। ক্রমশ তাহাদের শরীরে ফুসফুস গজায় এবং ঐ ফুলকা লোপ পায়। তখন তাহারা ফুসফুসের সাহায্যেই শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চালায় এবং জল হইতে উঠিয়া ডাঙার উপর বাকি জীবনটুকু কাটায়। অতএব দেখ, ব্যাঙের ছোটবেলা কাটে জলে, বড়বেলা কাটে ডাঙায়। ইহাদের



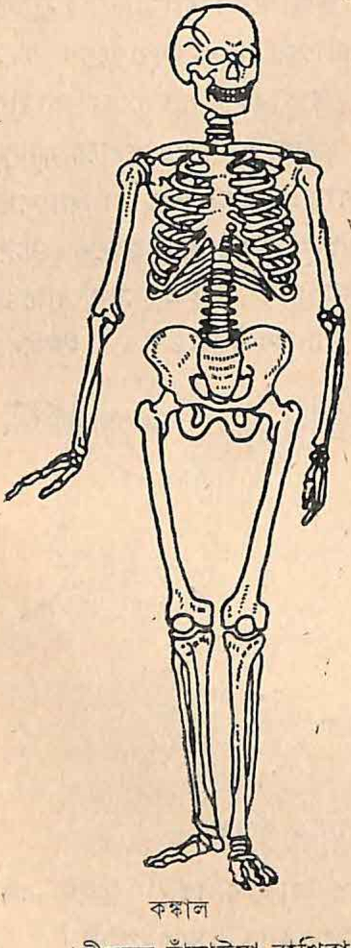
ডিম হইতে ব্যাঙে রূপান্তর

জলের জীব বলিব, না, ডাঙার জীব বলিব ? দুইই বলা উচিত। তাই বৈজ্ঞানিকদের মতে ব্যাঙ উভচর প্রাণী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমাদের দেহ

প্রতিমা গড়িবার সময় পটুয়ারা প্রথমে খড় ও বাঁশ দিয়া একটি শক্ত কাঠামো তৈয়ারী করিয়া লয়। তাহার উপর মাটি লাগাইয়া প্রতিমা গড়ে। আমাদের দেহের বেলাতেও অনেকটা সেইরূপ। দেহের ভিতরে একটি হাড়ের কাঠামো আছে। এই কাঠামোর নাম কঙ্কাল। হিসাব করিয়া দেখা যায়, সবসুদ্ধ ২০৬টি ছোট বড় নানা মাপের হাড় দিয়া এই কাঠামো তৈয়ারী। হাড়ের উপরে মাংস-পেশী। পেশীগুলি থাকার দরুণ আমরা ভিতরকার হাড়ের কাঠামোটি নানা ভাবে নাড়িতে পারি। মাংসপেশীর উপর ত্বক বা চামড়ার আবরণ।



কঙ্কাল

শরীর এইভাবে শুধু হাড়-মাংস চামড়া দিয়া গড়া নয়। শরীরকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য উহার ভিতর নানারূপ

কাজের ব্যবস্থাও আছে। এই সকল ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান হইল রক্তের চলাচল হওয়া, শ্বাস প্রশ্বাস লওয়া, খাদ্য হজম করিয়া শরীরের কাজে লাগানো,—ইত্যাদি।

এক এক ধরণের কাজ সমাধা করার জন্য কয়েকটি করিয়া যন্ত্র নির্দিষ্ট করা আছে। একই উদ্দেশ্যে শরীরের ভিতরকার যে-সব অঙ্গ মিলিয়া মিশিয়া কাজ করে তাহাদের সমষ্টিকে তন্ত্র বলা হয়। আমাদের শরীরের মধ্যে নানাপ্রকার তন্ত্র আছে।

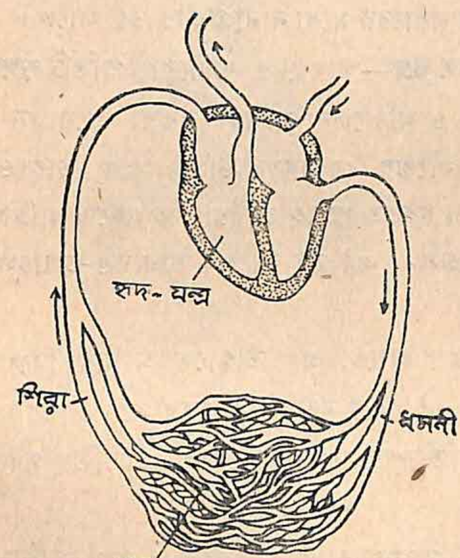
১। **রক্ত চলাচল তন্ত্র**—আমাদের শরীরের প্রতিটি সূক্ষ্ম অংশের নিকট খাদ্য ও অক্সিজেন সরবরাহ করা প্রয়োজন। শুধু তাহাই নহে ; খাদ্যের যে সকল উচ্ছিষ্ট অংশ, তাহাও শরীরের সমস্ত জায়গা হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। এই দুই কাজের ভার রক্ত-চলাচল তন্ত্রের উপর।

শরীরের ভিতর রক্ত আছে, এবং তাহাতে আসিয়া মিশে অক্সিজেন ও খাদ্য। এই রক্ত নদীর স্রোতের মত অবিরাম ছুটিয়া চলিয়াছে অতি সূক্ষ্ম শিরা, উপশিরা প্রভৃতির মধ্য দিয়া শরীরের সর্বত্র।

এইখানে একটি মজার ব্যাপার আছে। রক্ত ছুটিয়া চলিতে শুরু করে কোথা হইতে? এবং শেষ পর্যন্ত তাহা যায়ই বা কোথায় ? আমাদের বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড বলিয়া একটি যন্ত্র আছে। তাহার আবার দুইটি প্রধান কুঠরী। প্রত্যেকটি কুঠরী আবার দুইভাগে বিভক্ত। বামদিকের নীচের কুঠরী হইতে রক্ত ছুটিয়া চলা শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত ডানদিকের উপরের কুঠরীতে ফিরিয়া আসে। তাই, যেখানে এই পথের

শুরু সেখানেই আবার শেষ; রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইয়া আবার হৃৎপিণ্ডেই ফিরিয়া আসে। সারা দেহে তাজা অক্সিজেন ও খাদ্য সরবরাহ করিয়া রক্ত যখন হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে, তখন উহা শরীরের সমস্ত জায়গা হইতে খাবারের উচ্ছিষ্ট বহন করিয়া লইয়া আসে।

তাহা হইলে শরীরের ভিতর রক্তের এই যে ছুটিয়া চলা—ইহার গতি দুইদিকে। এক হইল, হৃৎপিণ্ড হইতে ভাল রক্তের গতি বাহিরের দিকে, আর এক হইল দূষিত রক্তের গতি হৃৎপিণ্ডের দিকে। রক্ত তো কতকগুলি নলের মধ্য দিয়া চলে তাই শরীরের ভিতর এই নলও দুই প্রকারের। যে নলগুলি দিয়া তাজা রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে বাহিরের দিকে আসে সেইগুলিকে বলা হয় **ধমনী**। যে-নলগুলি দিয়া দূষিত রক্ত হৃৎপিণ্ডের দিকে ফিরিয়া আসে সেই নলগুলির নাম হইল **শিরা**। ধমনীর ভিতর দিয়া যে-রক্ত চলিয়াছে তাহার মধ্যে তাজা খাদ্য ও অক্সিজেন



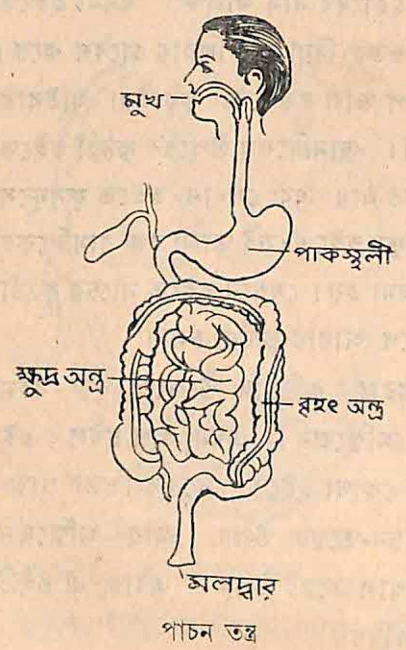
রক্ত-চলাচল তন্ত্র

রহিয়াছে ; তাই তাহার রং-ও টকটকে লাল। শিরার মধ্য দিয়া যে রক্ত হৃৎপিণ্ডের দিকে ফিরিয়া আসিতেছে তাহা শরীরের সব জায়গা হইতে আবর্জনা বহন করিয়া আনিতেছে। তাই তাহার রং অমন তাজা নহে ; কালচে ও নোংরা ধরণের। এই ভাল ও দূষিত রক্ত কিন্তু মিশিয়া যাইতে পারে না। কারণ ধমনী ও শিরার মাঝখানে আছে কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম নল। ইহাদের নাম **জালক**। ধমনী হইতে এই সব সূক্ষ্ম জালকের ভিতর দিয়া রক্ত শিরায় প্রবেশ করে। এখন কথা হইল, এইরূপে ভাল রক্ত তো ফুরাইয়া যাইবার কথা! কিন্তু তাহা হয় না। ডানদিকের উপরের কুঠরী হইতে দূষিত রক্ত নীচের কুঠরীতে যায় এবং সেখান হইতে ফুসফুসে গিয়া শোধিত হয়। ফুসফুস হইতে সেই তাজা রক্ত বামদিকের উপরের কুঠরীতে গিয়া জমা হয়। সেখান হইতে নীচের কুঠরী এবং তারপরেই ধমনী পথে আবার ছুটিয়া চলা।

শরীরের সর্বত্র সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে রক্ত বহন করিয়া চলিয়াছে খাদ্য ও অক্সিজেন। এখন, প্রশ্ন হইল : এই খাদ্য ও অক্সিজেন আসে কোথা হইতে ? রক্তের ভিতর খাদ্য-সরবরাহের ভার পাচন-তন্ত্রের উপর, আর অক্সিজেন সরবরাহের ভার শ্বাস-প্রশ্বাস তন্ত্রের উপর। এবার ঐ দুইটি তন্ত্রের কথা আলোচনা করিব।

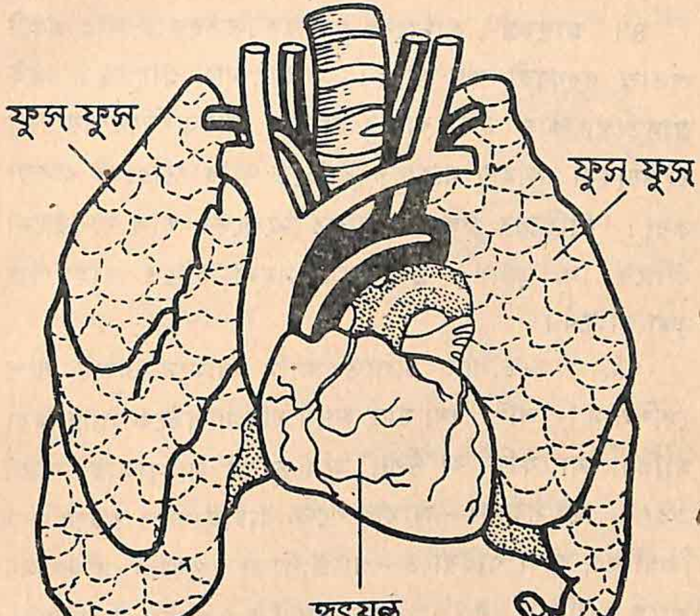
২। **পাচন-তন্ত্র**—আমরা যে-সকল খাবার খাই সেগুলি সোজাসুজি রক্তের সহিত মিলিয়া আমাদের দেহের কাজে লাগিতে পারে না। নানাভাবে অদল-বদল হইবার পরে তাহা শরীরের কাজে লাগে। কিরূপ অদল-বদল হয় তাহা দেখ।

প্রথমত, খাবার চিবাইয়া গিলিতে হয়। চিবাইবার সময় তাহার সহিত মুখের ভিতরকার লালা মিশে। তাহার পর, গলার নল বাহিয়া সেগুলি **পাকস্থলীর** মধ্যে গিয়া পড়ে। পাকস্থলী কুঁচকাইয়া ভিতরের খাবারকে একেবারে পিষিয়া ফেলে। শুধু তাহাই নহে, পাকস্থলীর গা দিয়া হজমী রসও বাহির হয়। তাহাতে গলিয়া খাবারটি গিয়া পড়ে পেটের নাড়িভুঁড়ির মধ্যে। এই নাড়িভুঁড়ির বৈজ্ঞানিক নাম **অন্ত্র**। পাকস্থলী হইতে নরম অবস্থায় খাবার গিয়া পড়ে **ক্ষুদ্র অন্ত্রের** মধ্যে। সেখানে আরও অনেক রকম হজমী রসের সরবরাহ হয়; তাহার সহিত মিশিয়া খাবার একেবারে তরল হইয়া যায়। এই তরল খাবারের যে অংশ আমাদের কাজে লাগে, তাহা রক্তের ভিতর চলিয়া যায়। বাকি অংশ জমা হয় **বৃহৎ অন্ত্রের** ভিতর। শেষ পর্যন্ত বৃহৎ অন্ত্র হইতে এই অপ্রয়োজনীয় অংশ মল হিসাবে শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়।



পাচন তন্ত্র

৩। **শ্বাস-প্রশ্বাস তন্ত্র**—রক্তের মধ্যে অক্সিজেন-এর সরবরাহ হয় কি ভাবে তাহা বলিতেছি। আমাদের বুকের মধ্যে হৃদ্-যন্ত্রের উভয় পাশে দুই অংশে বিভক্ত একটি যন্ত্র আছে, তাহার নাম **ফুসফুস্**। ইহা স্পঞ্জের মত ফাঁপা।



ইহার ভিতরে অনেক ছোট ছোট ঘর আছে। এই ঘর বা, খোপগুলির গা অত্যন্ত পাতলা এক রকম পর্দা দিয়া গড়া, তাহার মধ্যে রক্তের জালক আসিয়াছে। আমরা প্রশ্বাস লইবার সময় বাহির হইতে যে বায়ু গ্রহণ করি উহা বায়ুনলীর ভিতর দিয়া আসিয়া ফুসফুসের এই ছোট ঘরগুলিতে ঢোকে।

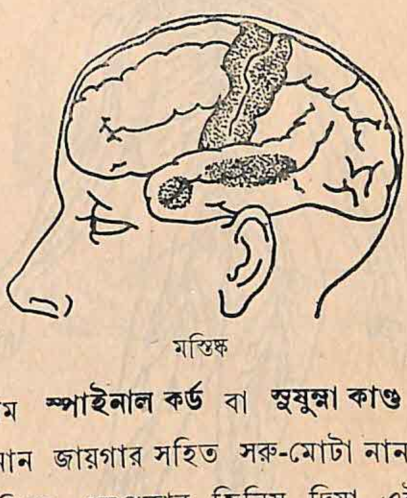
এই বায়ুতে যে অক্সিজেন থাকে তাহা তখন জালকের ভিতরকার রক্তের সহিত মিশিয়া রক্তকে শোধিত করে এবং উহার দূষিত অংশ অঙ্গারাম্ল রূপে নিঃশ্বাসের সহিত বাহিরে আসিয়া পড়ে। রক্তের ভিতর এইভাবেই অক্সিজেন সরবরাহ হয়।

৪। **স্নায়ুতন্ত্র**—আমাদের শরীরের ভিতরকার আর একটি অত্যন্ত দরকারী তন্ত্র আছে। তাহার নাম স্নায়ুতন্ত্র। এই স্নায়ুতন্ত্রের কাজ হইল বাহির-জগতের সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া আমরা যাহাতে বাঁচিতে পারি তাহারই ব্যবস্থা করা। বাহিরের জগতের সহিত নিজেদের খাপ খাওয়ানো বলিতে কি বুঝায়? দুই একটি নমুনা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

ধর, পথ চলিতে চলিতে আমি সামনে একটি সাপ দেখিলাম। সাপ দেখা মাত্র আমি যদি সাপটিকে লাঠি দিয়া মারিয়া না ফেলি, বা উল্টা মুখে ছুটিয়া না পালাই, তাহা হইলে তো সর্বনাশ—আমার পক্ষে বাঁচাই সম্ভব হইবে না! কিম্বা ধর, ক্ষুধা পাইয়াছে—গাছে পাকা পেয়ারা দেখিলাম। গাছে উঠিয়া সেই পেয়ারা খাইয়া পেট ভরাইলাম, এইভাবে কিছু খাবার সংগ্রহ করিয়া আমরা যদি পেট না ভরাই তাহা হইলে বাঁচিব কি করিয়া? এইরূপ নানা অবস্থায় নানারূপ ব্যবস্থা না করিলে আমাদের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইবে না। অবস্থা-মাফিক ব্যবস্থা করিবার নামই হইল বাহিরের সহিত নিজেদের খাপ খাওয়ানো।

সমস্যা হইতেছে, আমরা কিভাবে এই কাজ সমাধান করি? বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করিয়াছেন যে, ইহার মূলে রহিয়াছে আমাদের শরীরের স্নায়ুতন্ত্র। স্নায়ুতন্ত্র বলিতে কি বুঝায়?

আমাদের মাথার খুলির ভিতর অনেকটা ক্ষোয়া ক্ষীরের ন্যায় দেখিতে একতাল জিনিস আছে; তাহার নাম মস্তিষ্ক। ইহার নীচু দিক হইতে একটি শিকড়ের ন্যায় মোটা জিনিস নামিয়া গিয়াছে আমাদের পিঠের শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়া (শিরদাঁড়ার হাড়গুলি

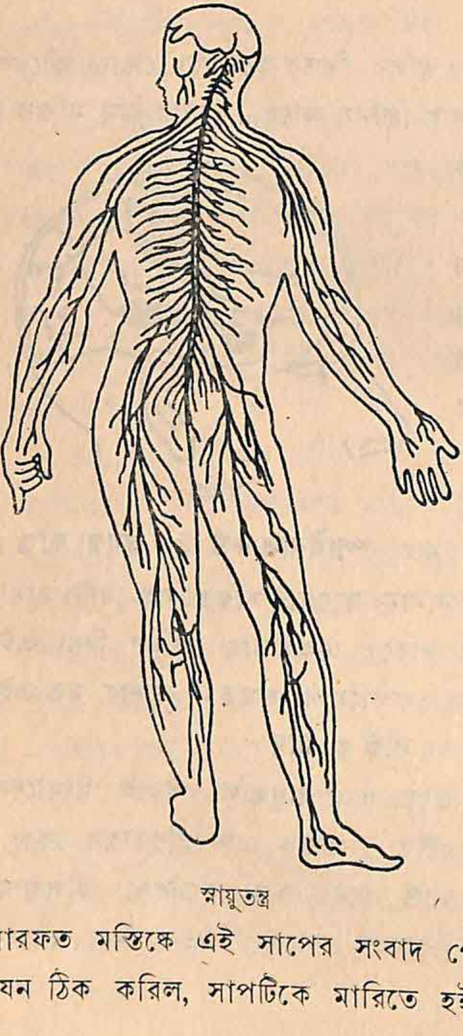


মস্তিষ্ক

ফাঁপা)। তাহার নাম **স্পাইনাল কর্ড** বা **সুষুম্না কাণ্ড**। আমাদের শরীরের নানান জায়গার সহিত সরু-মোটা নানা প্রকার সূতার মত দেখিতে একপ্রকার জিনিস দিয়া এই মস্তিষ্কের ও সুষুম্নার যোগাযোগ আছে। সূতার মত এই জিনিসগুলিকে বলা হয় **নার্ভ** বা **স্নায়ু**।

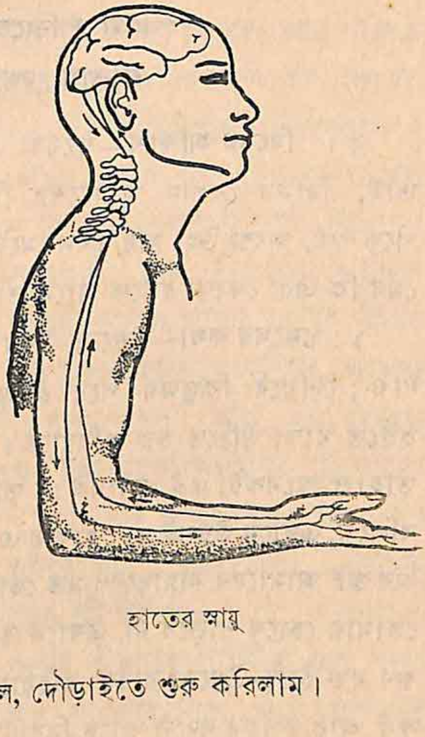
মোটের উপর সুষুম্না ও ঐ স্নায়ুগুলি লইয়াই আমাদের শরীরের স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। মস্তিষ্ক এই স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্র। এই যে স্নায়ু বা নার্ভ, এদের কাজ অনেকটা টেলিগ্রাফ তারের মত। টেলিগ্রাফের তারের ভিতর দিয়া খবরের

সংকেত যাতায়াত করে। নার্ভের ভিতর দিয়াও অনেকটা সেই রকম ব্যাপার ঘটে। এই সব নার্ভের ভিতর দিয়া প্রথমে বাহিরের খবর চলে সুষুম্না ও মস্তিষ্কের দিকে, পরে মস্তিষ্ক হইতে আবার পাল্টা খবর সরবরাহ হয় শরীরের নানা পেশী ও গ্রন্থির কাছে। এইবার বুঝিতে পারিবে, স্নায়ু-তন্ত্রের সাহায্যে আমরা কি ভাবে অবস্থা-মাফিক ব্যবস্থা করিতে পারি। ধর, সামনে সাপ দেখিলাম অর্থাৎ চোখ হইতে মস্তিষ্কের দিকে যে নার্ভ গিয়াছে তাহার মারফত মস্তিষ্কে এই সাপের সংবাদ পৌঁছাইল। মস্তিষ্ক যেন ঠিক করিল, সাপটিকে মারিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে



স্নায়ুতন্ত্র

হাতের স্নায়ুর ভিতর দিয়া মস্তিষ্কের হুকুম গিয়া পৌঁছিল হাতের পেশীতে। তখন হাতের পেশী-গুলি লাঠি ধরিয়া সাপকে মারিতে চেষ্টা করিল। অথবা মস্তিষ্ক হয়ত ঠিক করিল, এই অবস্থায় পলায়ন করাই প্রশস্ত। তখন মস্তিষ্ক হইতে (সুষুম্না হইয়া) যে নার্ভ পায়ের পেশী পর্যন্ত গিয়াছে সেই নার্ভ মারফত পেশীগুলির নিকট খবর আসিল দৌড় লাগাইবার। ফলে, দৌড়াইতে শুরু করিলাম।



হাতের স্নায়ু

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আকাশ দেখা

ক। **দিনের আকাশ**—সূর্যের আলোকেই দিন হয়। তাই, দিনের বেলায় আকাশের দিকে তাকাইলে প্রথমেই পড়ে সূর্য, অবশ্য উহা যদি তখন মেঘে ঢাকা না থাকে। এই মেঘ কি এবং কোথা হইতে আসে তাহা জান কি?

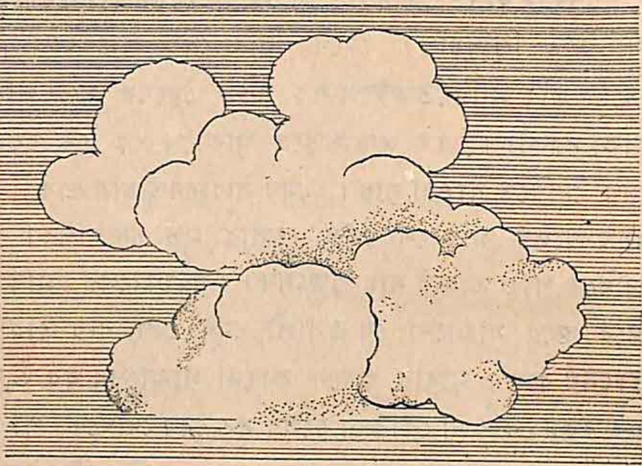
১। **মেঘের কথা**—উনুনের উপর এক হাঁড়ি জল চাপাইয়া দাও; দেখিবে কিছুক্ষণ পরে হাঁড়ির জল গরম হইয়া তাহা হইতে বাষ্প উঠিতে শুরু করিয়াছে। আকাশে যে মেঘ জমে তাহাও অনেকটা এই ভাবেই। তুমি হয়ত অবাক হইয়া বলিবে, এখানে উনুনই বা কোথায় এবং হাঁড়িই বা কোথায়! অবশ্যই আমাদের রান্নাঘরের মত ছোট উনুন বা হাঁড়ি এখানে তোমার চোখে পড়িবে না, এখানে তাহা অপেক্ষা লক্ষ-কোটি গুণ বড় হাঁড়ি-উনুনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। উনুন হইল আকাশের সূর্য আর হাঁড়ির বদলে আছে বিরাট বিরাট নদী ও সমুদ্র।

সূর্যের 'উত্তাপে সমুদ্র, নদী প্রভৃতির জল ক্রমাগতই বাষ্প হইতেছে। বাষ্প হইলেই তাহা আকাশের দিকে উঠিতে থাকিবে। কেননা, হাওয়ার তুলনায় বাষ্প অনেক হালকা। অবশ্য আকাশে বাষ্প সব সময়ই রহিয়াছে, কিন্তু সব সময় তাহা আমাদের নজরে পড়ে না। বাষ্প এক জায়গায় জমাট আকার ধরিলে পরই আমরা তাহা দেখিতে পাই এবং আমরা তাহাকেই মেঘ বলি।

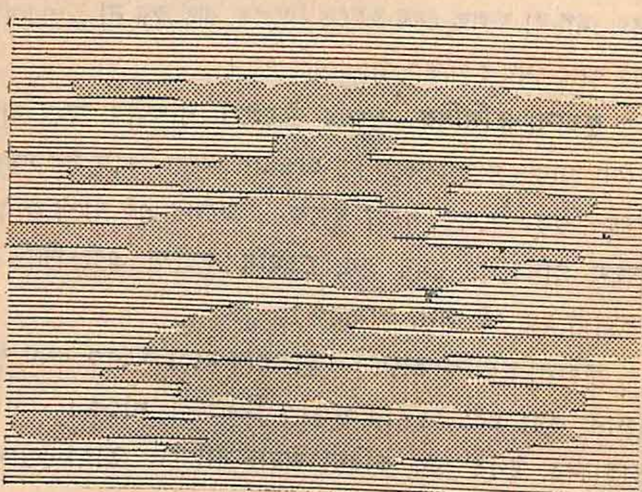
মেঘের ছবি—তোমরা নিশ্চয়ই নানা রকমের ছবি আঁকিতে শিখিয়াছ। মেঘের ছবি কেহ আঁকিয়াছ কি? মেঘের ছবি আঁকিতে হইলে সব রকম মেঘের সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। এক এক ঋতুতে আকাশে এক এক রকমের মেঘ দেখিতে পাওয়া যায়। মেঘ সাধারণত চার প্রকারের। বসন্তকালের আকাশে পেঁজা তূলার মত যে হালকা মেঘ দেখিতে পাও তাহার নাম **পুঞ্জমেঘ**। শরৎকালের আকাশে স্তরে স্তরে সাজানো যে রূপালী মেঘ দেখা যায় তাহাকে **স্তরমেঘ** বলে। আবার, কখনো কখনো আকাশের খুব উঁচুতে এক রকম কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের মত মেঘ দেখিতে পাওয়া যায়। চুলকে ভাল কথায় বলে অলক, তাই এই মেঘকে **অলকমেঘ** নাম দেওয়া হয়। বর্ষাকালের আকাশে গাঢ় কালো রং-এর মেঘ দেখা যায়। ইহার নাম **ধূসরমেঘ**। পুঞ্জ মেঘ স্তর মেঘ বা অলক মেঘ হইতে বিশেষ বৃষ্টি হয় না, একমাত্র এই ধূসর মেঘ হইতেই প্রচুর বৃষ্টি হয়।

কুয়াসা ও শিশির—সূর্যের উত্তাপে পৃথিবীর জল বাষ্প হইয়া আকাশে উঠিতেছে। হাওয়ার মধ্যে তাই সব সময়ই কিছু কিছু জলের বাষ্প থাকে। জলের এই বাষ্প জমিয়া যেমন আকাশের মেঘ হয়, তেমনি কুয়াসা এবং শিশিরও তৈয়ারী হয় এই বাষ্প জমিয়াই।

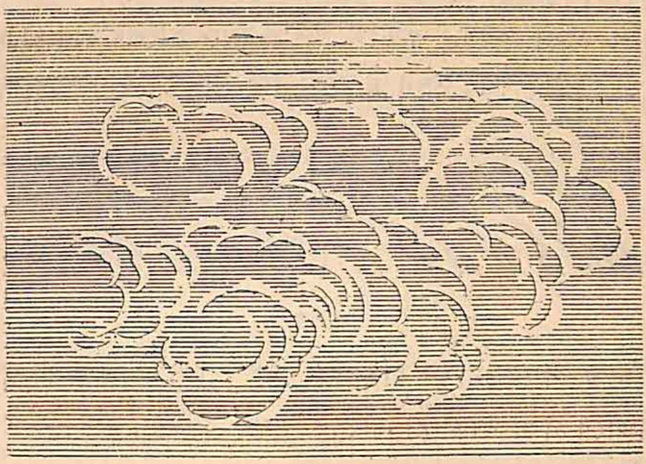
কুয়াসা হয় কি ভাবে? হাওয়ার মধ্যে অনেক সময় সূক্ষ্ম ধুলার কণা এবং কয়লার গুঁড়াও মিশানো থাকে। বাষ্প তাহাদের উপর ভর করিয়া জমাট বাঁধিলে তাহা কুয়াসায় পরিণত হয়।



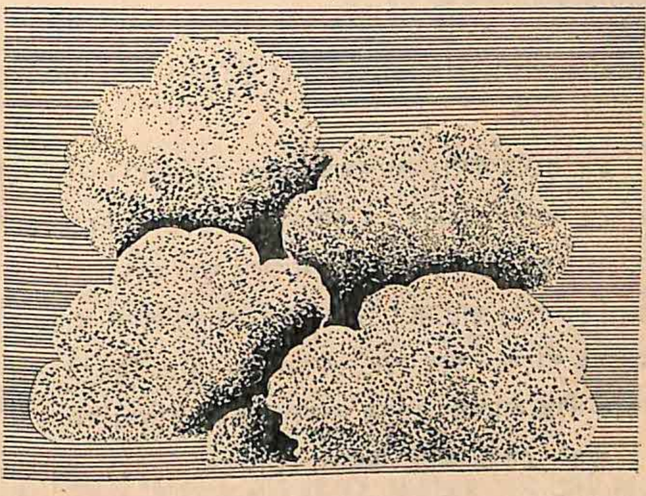
পুঞ্জ মেঘ



স্তর মেঘ

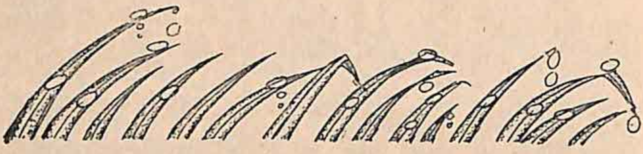


অলক মেঘ



ধূসর মেঘ

শিশির হয় কি ভাবে? রাত্রি বেলায় পাতা বা ঘাস খুব বেশি ঠাণ্ডা হইয়া পড়িলে উহার আশেপাশের বায়ু দারুণ ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। তখন ঐ ঠাণ্ডা বায়ু আর বেশি বাষ্প ধরিয়া



শিশির

রাখিতে পারে না। হাওয়ার সেই বাষ্প তখন জলকণার আকারে ঠাণ্ডা পাতা বা ঘাসের উপর জমিয়া যায়—ইহাই শিশির।

বৃষ্টি—ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে আসিলে মেঘের ভিতরকার জলকণারা একত্র হইয়া জমাট বাঁধিতে থাকে। এইভাবে, তাহারা ক্রমশ জলের ফোঁটায় পরিণত হয়! জলের ফোঁটা হাওয়া অপেক্ষা বেশি ভারি বলিয়া বৃষ্টিরূপে পৃথিবীর দিকে নামিয়া আসে।

২। **সূর্যের কথা**—রাতের আকাশে কত তারা চোখে পড়ে। দেখিতে আলোকবিন্দুর মত বলিয়া সাধারণভাবে ইহাদের বলা হয় জ্যোতিষ্ক। দিনের আকাশে কিন্তু সূর্য ছাড়া আর কোন জ্যোতিষ্ক দেখা যায় না। দিনে কি আকাশে তারা থাকে না? নিশ্চয়ই থাকে, তবে সূর্য আমাদের অতি নিকটে বলিয়া ইহার তীব্র আলোর তেজে তাহারা ঢাকা পড়িয়া যায়।

সূর্য একটি অতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ইহা আলো ও তাপের উৎস। ইহা আয়তনে আমাদের পৃথিবীর তের লক্ষ

গুণ এবং পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। তোমরা বলিবে, তবে ইহা আমাদের কাছে হইল কিরূপে ? কাছে বৈকি! অন্যান্য জ্যোতিষ্ক যে সূর্যের চেয়েও কোটি কোটি গুণ দূরে অবস্থিত। এত দূরে বলিয়াই উহাদের এত ছোট দেখায়।

সূর্যকে আগুনের এক বিরাট গোলার সঙ্গে তুলনা করা যায়। সূর্যের উত্তাপ কিরূপ প্রচণ্ড তাহা জ্যৈষ্ঠমাসের কাঠ-ফাঠা রৌদ্রে দাঁড়াইলে কিছুটা বুঝিতে পারিবে, বিশেষ করিয়া যখন জানিলে যে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূর হইতে এই তাপ আসিতেছে।

সূর্যের কাজ—সূর্যের সব চেয়ে বড় কাজ তাপ ও আলো দিয়া আমাদের বাঁচাইয়া রাখা। সূর্যের তাপে আকাশে মেঘ হয়, সেই মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, জমিতে চাষ-আবাদ চলে, ক্ষেতে ক্ষেতে সোনার ফসল ফলে, পৃথিবী সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা হয়। সূর্যের তাপ জীব-জন্তু ও গাছ-গাছড়ার শক্তি যোগায়। সূর্যের আলো না হইলে আমাদের যে কি দুর্দশা হইত তাহা তোমরা সহজেই অনুমান করিতে পার। পৃথিবীতে দিন রাত্রি হইত না—একটানা অন্ধকারে আমাদের থাকিতে হইত। কোন কাজকর্ম করিতে পারিতাম না। গাছপালাও মরিয়া যাইত। এক কথায় সূর্যের অভাবে কিছুই বাঁচিতে পারিত না।

খ। **রাতের আকাশ**—রাতের আকাশে সূর্য নাই। তাই দিনের বেলায় সূর্যের তেজে যে সব জ্যোতিষ্ক দেখা যায় না, রাত্রিতে তাহাদের দেখা যায়।

১। **চাঁদের কথা**—রাতের আকাশে যে-জিনিসটিকে আমরা সবচেয়ে উজ্জ্বল ও বড় দেখি তাহা হইল চাঁদ। চাঁদের আলোক পৃথিবীতে আসিয়া পড়িলে আমাদের চোখে কি অপরূপই না লাগে! আসলে কিন্তু এই আলো চাঁদের নিজের নয়। ইহাকে সূর্যের নিকট হইতে ধার-করা আলো বলিতে পার। আয়নার উপর আলো পড়িলে সেই আলো যেমন অন্যদিকে ঠিকরাইয়া পড়ে, অনেকটা সেই ভাবেই সূর্যের আলো চাঁদের উপর পড়িয়া তাহা হইতে ঠিকরাইয়া পৃথিবীতে আসে।

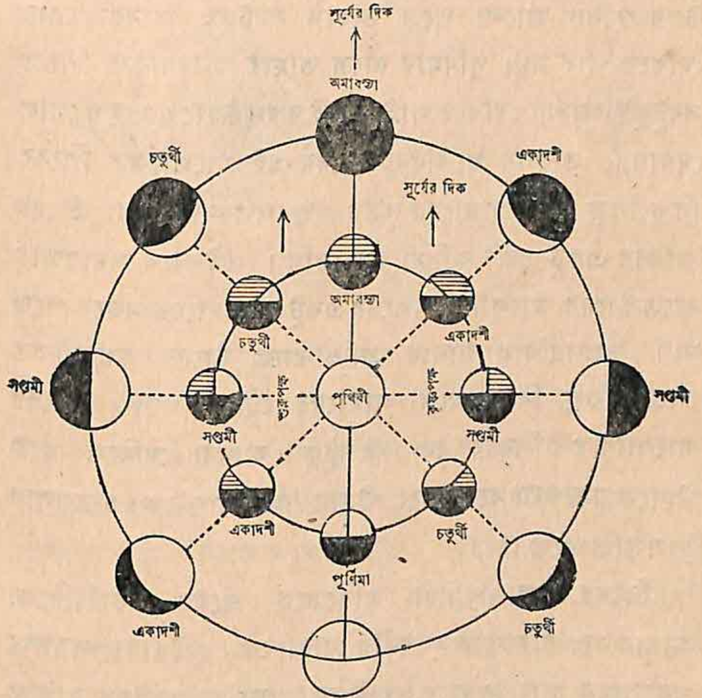
আকাশে চাঁদকে সূর্যের সমান দেখায়। কিন্তু আসলে চাঁদ কিন্তু অতি ছোট। ইহা আমাদের পৃথিবী হইতেও ছোট। প্রায় পঞ্চাশটা চাঁদ একত্র করিলে আমাদের পৃথিবীর সমান হইবে। তবু ইহাকে সূর্যের সমান দেখায় কেন? ইহার কারণ, চাঁদ আমাদের অতি কাছে—মাত্র দুই লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মাইল দূরে।

চাঁদে জল নাই, হাওয়া নাই, গাছপালা বা জীবজন্তুও নাই। আছে শুধু উঁচু পাহাড়, পাহাড়ের মাঝে মাঝে গর্ত, আর চারি ধার উঁচু বিরাট বিরাট সমতল ভূমি। অনুমান করা হয় এগুলি শুষ্ক সমুদ্র-গর্ভ। সূর্যের আলোতে পাহাড়গুলিকে উজ্জ্বল দেখায়, কিন্তু শুষ্ক সমতল সমুদ্র-গর্ভ হইতে আলো ভাল রূপে ঠিকরাইতে পারে না বলিয়া এগুলিকে কালো কালো দাগের মত দেখায়। এই কালো দাগগুলিকেই বলা হয় **চাঁদের কলঙ্ক**।

চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে। একবার ঘুরিয়া আসিতে

ইহার প্রায় সাড়ে উনত্রিশ দিন লাগে। এই সময়কে **চান্দ্র মাস** বলে।

চন্দ্রকলা—সকল রাত্রিতেই আমরা চাঁদকে সমান আকারের দেখি না। কখনো উহা রূপার থালার মত গোল, কখনো সরু



চন্দ্রকলা

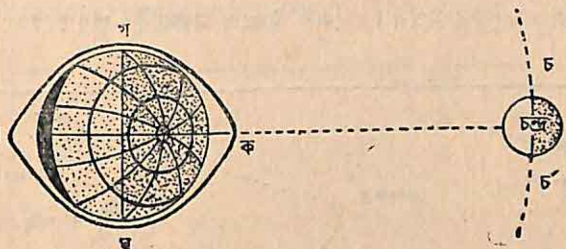
কাস্তের মত বাঁকা, কখনো বা উহাকে মোটেই দেখা যায় না। এরূপ কেন হয়? তোমরা জান চাঁদের নিজের আলো

নাই। সূর্যের আলো চাঁদের উপর পড়িবার পর ঠিকরাইয়া পৃথিবীতে আসিলে আমরা উহাকে দেখি। চাঁদ গোল তাই চাঁদের যে পিঠটির উপর সূর্যের আলো পড়ে শুধু সেই পিঠটিই আমাদের পক্ষে দেখিতে পাওয়া সম্ভব। শুধু তাহাই নহে; চাঁদ পৃথিবীর চারিপাশে ঘুরিতেছে বলিয়া উহার যে পিঠের উপর সূর্যের আলো পড়ে তাহার সবটুকুও আমরা রোজ দেখিতে পাই না। পূর্ণিমার রাত্রে তাহার আলোকিত পিঠের সবটুকুই আমরা দেখিতে পাই; তাই তখন উহাকে সম্পূর্ণ গোল দেখায়। তারপর প্রতিদিনই চাঁদের এই আলোকিত পিঠের কিছু কিছু অংশ আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে যায় এবং চাঁদের আকার একটু একটু করিয়া কম দেখি। এইভাবে অমাবস্যার রাত্রে চাঁদের আলোকিত পিঠের একটুও আমাদের নজরে পড়ে না। তাহার পর আবার প্রতি রাত্রে চাঁদের আলোকিত পিঠের কিছু কিছু অংশ আমাদের চোখে পড়ে। চাঁদের আলোকিত পিঠের যে অংশটুকু আমরা দেখিতে পাই উহাকে **চন্দ্রকলা** বলে এবং উহার কমা-বাড়াকে চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি বলে।

চাঁদের কাজ—পৃথিবী ঘুরিতেছে সূর্যের চারিদিকে, আবার চন্দ্র ঘুরিতেছে পৃথিবীর চারিদিকে। ইহারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তাই কেহ ছুটিয়া চলিয়া যাইতে পারে না। চাঁদ আমাদের খুব কাছে বলিয়া ইহার আকর্ষণ পৃথিবীর উপরে খুব বেশি। এই আকর্ষণের দরুন পৃথিবীর বুকে নদী ও সমুদ্রের জল ফাঁপিয়া উঠে এবং জোয়ার-ভাঁটা হয়।

ইহা ছাড়াও অবশ্য রাত্রির অন্ধকারে চাঁদের আলো আমাদের নানা কাজে লাগে।

২। **নক্ষত্রের কথা**—রাতের আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র বা তারা দেখা যায়। এগুলি সূর্যের চেয়েও বড় এবং বহুদূরে



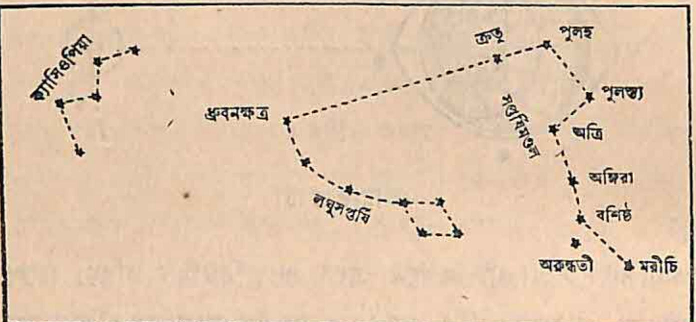
জোয়ার ভাঁটা

অবস্থিত। তারাগুলি কখনো একা একা মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলে, কখনো বা অনেকগুলি এক সঙ্গে দল বাঁধিয়া আছে বলিয়া মনে হয়। এইসব তারার দলকে বলা হয় **নক্ষত্র মণ্ডল**।

ধ্রুবতারা—শীত-গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই উত্তর আকাশে একটি উজ্জ্বল তারা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই ধ্রুবতারা। এই তারাটি সব সময়ই আকাশের উত্তর দিকে এক জায়গায় স্থির ভাবে রহিয়াছে। ইহার উদয় নাই; অস্তও নাই। এই ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করিয়া রাত্রিবেলায় দিক নির্ণয় করা যায়।

সপ্তর্ষি মণ্ডল—চৈত্র ও বৈশাখ মাসে সন্ধ্যার পর আকাশের উত্তর দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে সাতটি উজ্জ্বল তারা মিলিয়া আকাশের অন্ধকারে একটি যেন জিজ্ঞাসার চিহ্ন আঁকিয়াছে। আমাদের দেশের প্রাচীনেরা সাতজন ঋষির

নামে এই সাতটি নক্ষত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন। তাই আমাদের দেশে এই নক্ষত্রমণ্ডলকে বলা হয় সপ্তর্ষিমণ্ডল। এখন এই সপ্তর্ষিমণ্ডলের মাথার দিককার দুইটি তারাকে মিলাইয়া যদি একটি সরল রেখা মনে মনে কল্পনা করিতে পার তাহা হইলে দেখিবে ঐ সরল রেখাটি গিয়া পড়িতেছে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের উপর। সেই উজ্জ্বল নক্ষত্রই ধ্রুবতারা।

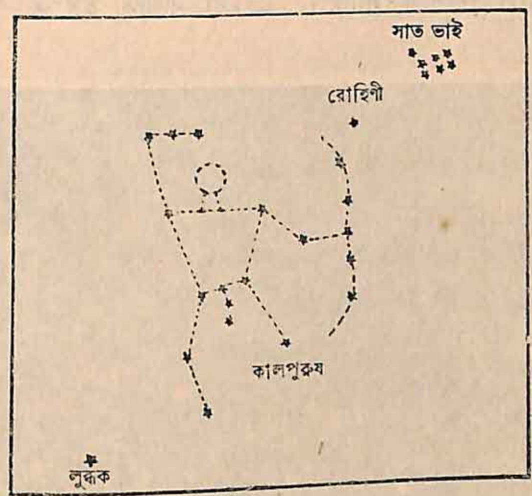


সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ক্যাসিওপিয়া

ক্যাসিওপিয়া—সপ্তর্ষিমণ্ডলের যে-দিকে ধ্রুবতারা তাহার উল্টা দিকে নজর করিলে দেখিবে পাঁচটি তারা মিলিয়া আর একটি নক্ষত্রমণ্ডল গড়িয়া উঠিয়াছে। তারা পাঁচটি মিলিয়া আকাশে একটি ইংরাজী W হরফ আঁকিয়াছে বলিয়া কল্পনা করা যায়। এই নক্ষত্রমণ্ডলের নাম ক্যাসিওপিয়া। আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে দেখা না গেলেও ক্যাসিওপিয়ার সাহায্যে ধ্রুবতারাকে চিনিতে পারা সম্ভব।

কালপুরুষ—আকাশের আর একটি নক্ষত্রমণ্ডলের নাম দেওয়া হয় কালপুরুষ। এই মণ্ডলের তারাকয়টি মিলিয়া যেন

এক বিরাট-দেহ ব্যাধের ছবি মনে করাইয়া দেয়। হেমন্তকালে সন্ধ্যার দিকে ইহাকে পূব আকাশে এবং গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যায় ইহাকে পশ্চিম আকাশে দেখিতে পাইবে। কিন্তু ইহার মধ্যে ব্যাধের মূর্তি কল্পনা করিতে তোমাকে বেশ বেগ পাইতে হইবে। অবশ্য চেষ্টা করিলে, ব্যাধের হাতে তীর ধনুক এবং কোমরে তলোয়ার পর্যন্ত হয়ত দেখিতে পাইবে।

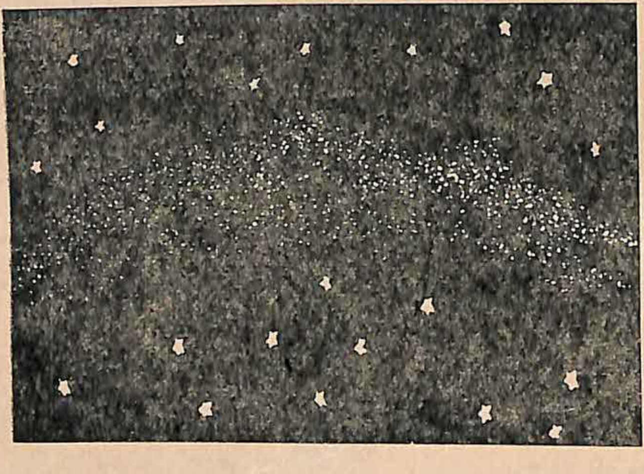


কালপুরুষ

সন্ধ্যাতারা—বছরে কোন কোন সময় সন্ধ্যাবেলায় পশ্চিম আকাশে বড় তারার মত একটি জ্বলজ্বলে আলোকবিন্দু দেখা যায়। ইহার নাম **সন্ধ্যাতারা**। আসলে কিন্তু ইহা পৃথিবীর মতই একটি গ্রহ এবং পৃথিবীর মতই ইহা সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। ইহার নাম শুক্রগ্রহ। শুক্র যখন আপন চলার পথে পৃথিবীর খুব কাছে আসে তখনই উহাকে এত উজ্জ্বল

ও বড় দেখা যায়। কখন কখন ইহাকে ভোর রাতের দিকে পূব আকাশেও দেখা যায়। তখন ইহাকে বলে **শুকতারা**।

ছায়াপথ—অমাবস্যার রাত্রে ভাল করিয়া আকাশের দিকে তাকাইও। আকাশে যদি মেঘ থাকে তাহা হইলে দেখিবে, আকাশের এদিক হইতে ওদিক অবধি যেন একটি সাদা পথ রহিয়াছে। এইটির নাম ছায়াপথ। আসলে ইহা কোটি কোটি তারার সমষ্টি। আমরা বহুদূর হইতে দেখি

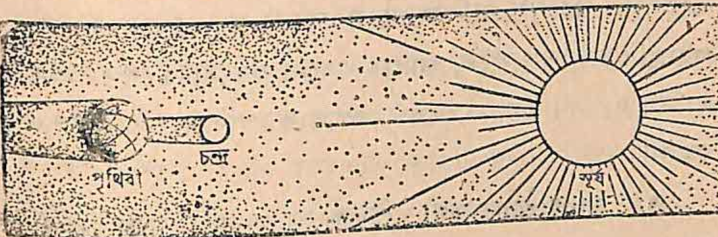


ছায়াপথ

বলিয়া ইহাদের এক সঙ্গে মিশাইয়া ফেলি এবং মনে করি আকাশে একটি সাদা পথের মত কি যেন রহিয়াছে।

গ। সূর্যগ্রহণ—সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে পৃথিবী, আবার পৃথিবীকে ঘিরিয়া ঘুরিতেছে চন্দ্র। এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে অমাবস্যার দিনে চন্দ্র আসে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে, প্রায়

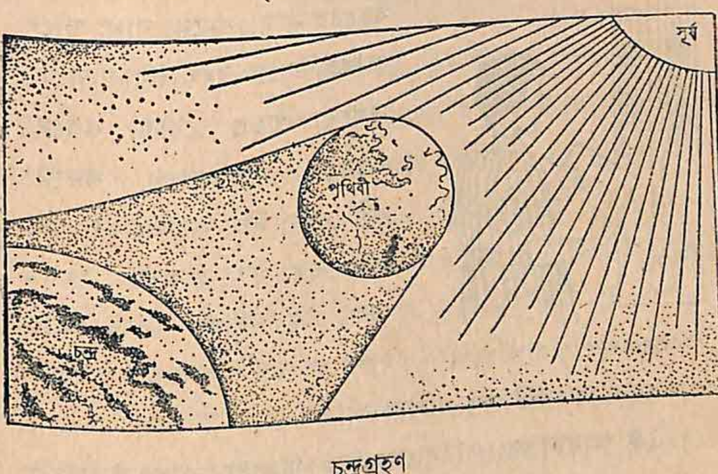
এক সরলরেখায়। সূর্যের আলো তখন চন্দ্রকে ভেদ করিয়া আসিতে পারে না। তখন সূর্যের খানিকটা অংশ কোন কোন স্থানের লোকে দেখিতে পায় না, কারণ চন্দ্র উহাকে আড়াল



সূর্যগ্রহণ

করিয়া রাখে। ইহাকেই বলে সূর্যগ্রহণ। সব অমাবস্যায়ই কিন্তু সূর্যগ্রহণ হয় না।

ঘ। **চন্দ্রগ্রহণ**—ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবী ও পূর্ণিমার দিনে সূর্য



চন্দ্রগ্রহণ

ও চন্দ্রের মাঝে আসিয়া পড়ে। তখন কি হয়? এই অবস্থায় যদি সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র একই সরলরেখায় থাকে তাহা হইলে

পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর গিয়া পড়িবে, ফলে পৃথিবী হইতে ছায়ায় ঢাকা চন্দ্রকে দেখা যাইবে না। ইহারই নাম হইল চন্দ্রগ্রহণ। অবশ্য, পৃথিবীর ছায়া যে প্রত্যেক বারই চন্দ্রকে একেবারে পুরাপুরি ঢাকিয়া ফেলে তাহা নহে ; কখনো কখনো পুরাপুরি ঢাকিয়া ফেলে, আবার কখনো কখনো চন্দ্রের মাত্র খানিকটা ঢাকিয়া ফেলে। প্রত্যেক পূর্ণিমায়ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না।

৬। **আবহাওয়ার কথা**—শীতকালে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বহে ও গাছের পাতা শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। কিছুদিন পরই আবার গাছে নূতন পাতা দেখা দেয়, শোনা যায় কোকিলের গান। ইহা বসন্তকাল। এইভাবে, বছরের নানা সময়ে নানা ভাবে আবহাওয়া বদলাইয়া যায়। কখনো প্রচণ্ড রৌদ্র, কখনো আকাশ মেঘে ঢাকা, কখনো বৃষ্টি-ধোয়া নীল আকাশে পাখীর পালকের মত হালকা মেঘ। এক এক রকম আবহাওয়ার দরুন বছরের এক একটি সময়কে আমরা এক একটি ঋতু বলিয়া থাকি।



বায়ুর তাপ ও চাপ মাপা

এই আবহাওয়া পরিবর্তনের একটি প্রধান কারণ উত্তাপের পরিবর্তন। খবরের কাগজে দেখিবে, আমাদের দেশের কোন্ স্থানে কতখানি উত্তাপ তাহার হিসাব নিয়মিত বাহির

হয়। থার্মোমিটার দ্বারা এই উত্তাপ মাপা হয়। আর বায়ুর চাপ মাপা হয় ব্যারোমিটার যন্ত্রে।

তুমি যে শহর বা গ্রামে থাক, সেখানের উত্তাপ প্রতিদিন কি ভাবে উঠিতেছে-নামিতেছে তাহার একটি ছক আঁকিতে চেষ্টা কর। সেই সঙ্গে বায়ু কোনদিক হইতে বহে, ঝড় হয় কি না, বৃষ্টির পরিমাণ কিরূপ, আকাশে মেঘ আছে কি না ইত্যাদিও টুকিয়া রাখিবে। এক বছর পর তোমার ছক পরীক্ষা করিয়া বিভিন্ন ঋতুর বৈশিষ্ট্য তুমি নিজেই ধরিতে পারিবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাটির কথা

হাজার হাজার বছর ধরিয়া বৃষ্টি, তুষারপাত প্রভৃতির ফলে পৃথিবীর উপরিভাগের শিলা চূর্ণ হইয়াছে এবং তাহার সহিত মিশিয়াছে পৃথিবীর আদিম গাছপালা এবং প্রাণীদের মৃতদেহের অংশ। এইভাবে শিলার সহিত জৈব ও অন্যান্য জিনিস মিশিয়া যাহা তৈয়ার হইল তাহারই নাম মাটি।

মাটির প্রকার ভেদ—মাটি অবশ্য একপ্রকারের নয়, নানা প্রকারের—

১। **বেলে মাটি**—বেলে মাটির মধ্যে দশভাগের প্রায় নয় ভাগ বালি, বাকী একভাগ মাত্র কাদা। চাষবাসের পক্ষে এই মাটি মোটেই ভাল নয়। কেন না, ইহার ভিতরে বালি বেশি বলিয়া ইহার পক্ষে জল ধরিয়া রাখিবার শক্তি নাই। মাটির

ভিতর জল যদি থাকিতে না পারে তাহা হইলে সেখানে গাছপালা কিরূপে বাঁচিবে? অবশ্য বেলেমাটির উপর নদীর পলি পড়িলে পর সেখানে তরমুজ, কাঁকুড়, পটল প্রভৃতি ভাল জন্মে।

২। **কাদা মাটি**—কাদা মাটির শতকরা পঁচাত্তর ভাগ কাদা। সাধারণত নদী, বিল প্রভৃতির পাশে এই মাটি পাওয়া যায়। ইহার পক্ষে জল ধরিয়া রাখিবার শক্তি থাকিলেও চাষবাসের পক্ষে এই মাটিও ভাল নয়। কারণ, ইহার ভিতরটা এমনই নিরেট যে, হাওয়া থাকিবার বিশেষ ব্যবস্থা নাই।

৩। **এঁটেল মাটি**—কাদা মাটি যখন শুকাইয়া যায় তখন তাহাকে এঁটেল মাটি বলা হয়। ফলে এঁটেল মাটিও চাষবাসের পক্ষে ভাল নহে।

৪। **দো-আঁশ মাটি**—এই মাটিই চাষবাসের পক্ষে সবচেয়ে ভাল। ইহার ভিতর প্রায় অর্ধেক কাদা এবং অর্ধেক বালি থাকার দরুন ইহার পক্ষে জল ধরিয়া রাখা ও ইহার ভিতর হাওয়ার জন্য জায়গা থাকা দুইই সম্ভব হয়।

৫। **কাঁকর মাটি**—ভিতরে কাঁকর বেশি থাকে বলিয়াই এই মাটির নাম কাঁকর মাটি। ধান চাষের জন্য এই মাটি বেশ ভাল।

৬। **লাল মাটি**—ইহার ভিতর লোহা থাকে; সেইজন্য ইহার রং লাল। পশ্চিম বাংলার বীরভূম অঞ্চলে এই মাটি দেখিতে পাইবে। এ মাটিতেও ধান চাষ ভাল হয়।

মাটির উর্বরতা—মাটির যে-শক্তির দরুন গাছপালা বাঁচিতে ও বাড়িতে পারে তাহারই নাম উর্বরতা। মাটির উর্বরতা

নির্ভর করে জৈব ও অজৈব দুইরকম জিনিসের উপর। প্রাণী ও গাছপালার মৃতদেহ, মল মূত্র প্রভৃতি জৈব পদার্থ। অজৈব পদার্থ বলিতে বালি, জল, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, নাইট্রোজেন-যুক্ত জিনিস প্রভৃতি বুঝায়। বৃষ্টির দরুন পাহাড়-পর্বতের সূক্ষ্ম অংশ নদীর স্রোতের সহিত বহিয়া আসে এবং প্রধানত এই স্রোতই দেশ-বিদেশের মাটিতে অজৈব জিনিস সরবরাহ করিয়া যায়। আবার, গাছ পাতা পচিয়া, মরা প্রাণীর দেহ পচিয়া, এবং মাটির উপর নানা প্রাণীর মলমূত্র পচিয়া নানা ভাবে মাটির মধ্যে জৈব জিনিসগুলির সরবরাহ হইয়া থাকে।

একই জমিতে বারবার ফসল হইতে থাকিলে সেই জমির ভিতরকার জৈব-অজৈব দুইরকম জিনিসই কমিয়া মাটির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। তখন মাটির ভিতর ঐ সকল জিনিসের যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ইহাকে বলে জমিতে সার দেওয়া। তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতেছ যে, মাটির সার দুই রকম—জৈব ও অজৈব। জৈব সার উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের কাছ হইতে সংগ্রহ করা হয়—যেমন গোময়, গোমূত্র, খোল, হাড়ের গুঁড়া, পচা পাতা ইত্যাদি। অজৈব সার হইল, পটাসিয়াম্ নাইট্রেট, ক্যালসিয়াম্ ফস্‌ফেট, এ্যামোনিয়াম্ সালফেট ইত্যাদি।

মাটির ক্ষয়—বৃষ্টিতে ধুইয়া যাইবার দরুন, কিংবা উপর দিয়া নদীর স্রোত বহিয়া যাইবার দরুন, অনেক সময় মাটির ভিতরকার লবণজাতীয় জিনিস ধুইয়া মাটিকে ক্ষয় করিয়া থাকে। ক্ষয় বন্ধ করিবার একটি উপায় হইল চাষের জমি ছোট

খাট অংশে ভাগ করিয়া তাহার চারিপাশে উঁচু আল দেওয়া এবং আশেপাশে গাছপালা রোপন করা। জমিগুলি যাহাতে মোটামুটি সমতল হয় সে দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহা হইলে, বৃষ্টির জল মাটির উপর দিয়া জোরে বহিতে পারিবে না, ফলে মাটির ক্ষয়ও বন্ধ হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চাষের জমি ও পুকুর

জমি পর্যবেক্ষণ—চাষের জমি নিয়মিত ভাবে না দেখিয়া রাখিলে ভাল ফসল পাইবার সম্ভাবনা কম। যে জমিতে যত বেশি যত্ন নেওয়া হইবে সে জমিতে তত ভাল ফসল হইবে।

ধানের জমির কথাই ধরা যাক্। চাষ করিয়া ধান বোনা হইয়াছে—ছোট ছোট চারা উঠিয়াছে। যদি চারা খুব ঘন থাকে তবে নিড়াইয়া উহা উপযুক্তমত রাখিতে হইবে। জমিতে আগাছা হইয়া থাকিলে তাহাও পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। বৃষ্টি হইয়া কোথাও বেশি জল জমিয়া থাকিলে উহা বাহির করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আবার জলের অভাবে চারা বাড়িতে না পারিলে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পশুপাখী, কীটপতঙ্গ যাহাতে ফসল নষ্ট করিতে না পারে, যাহাতে মাটি ক্ষয় না পায় সে দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তারপর জমির মাটি পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত সারের ব্যবস্থা করা, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া রকমারি ফসল ফলানো ইত্যাদিও যত্ন সহকারে করিতে হয়। নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা

করিয়া এইসব কাজ করিলে জমি ভাল থাকে, প্রচুর ফসল উৎপাদন করাও সম্ভব হয়।

পুকুর পর্যবেক্ষণ—জমির মত নিয়মিত ভাবে যত্ন না করিলে পুকুরের অবস্থাও খারাপ হইয়া পড়ে। পুকুর হইতে আমরা পানীয় জল পাই। সুতরাং কচুরী পানা জন্মিয়া, বা লতাপাতা পচিয়া, বা মলমূত্র পড়িয়া যাহাতে জল নষ্ট না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। আবার পুকুরে মাছ জন্মাইতে হইলে নদী, খাল প্রভৃতি হইতে মাছের ছোট ছোট বাচ্চা সংগ্রহ করিয়া পুকুরের ভিতর ছাড়া দরকার।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

স্বাস্থ্যরক্ষার কথা

বায়ু ও জল ছাড়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। এই বায়ু ও জল একটুখানি দূষিত হইলেই মানুষের স্বাস্থ্যও নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয় এই দুইটি জিনিস সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান রাখা প্রত্যেকেরই কর্তব্য।

বায়ু

বায়ু প্রবাহ—বায়ুর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলার নাম বায়ুপ্রবাহ। দুই স্থানের তাপ কম বেশি হইলেই বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি হয়। বায়ু প্রবাহ স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়। স্থির বায়ু নানা কারণে দূষিত হইয়া উঠে। বায়ু প্রবাহ সেই খারাপ হাওয়ার হাত হইতে আমাদের রক্ষা করে।

বায়ুর ধর্ম—প্রধানত অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন এই দুইটি গ্যাস মিশাইয়া বায়ু হইয়াছে। ইহার রঙ নাই, নির্দিষ্ট আয়তনও নাই। বাতাসের অক্সিজেন ছাড়া আগুন জ্বলিতে পারে না। বাতাস গরম হইলে উপরে উঠিয়া যায় আর আশেপাশের ঠাণ্ডা বাতাস সেই স্থান পূর্ণ করিতে আসে। বাতাসের এই ধর্মের উপর নির্ভর করিয়াই ঘরে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়।

মুক্ত বায়ু—বাতাস সর্বদা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বহিয়া বেড়াইতেছে। আমরা ঘর-বাড়ী তৈরী করিয়া উহাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলি। কিন্তু বদ্ধ বাতাস স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, কারণ উহা সহজেই দূষিত হইয়া পড়ে। মুক্ত বায়ু অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর। ইহার সহিত খারাপ বাতাস মিশিলেও নানারূপে তাহা শোধিত হইতে পারে। কাজেই ঘর-বাড়ী এরূপ ভাবে ও এরূপ স্থানে নির্মাণ করা দরকার যাহাতে মুক্ত বাতাস অবাধে উহার ভিতর দিয়া চলাচল করিতে পারে।

বায়ুর উপাদান—বিশুদ্ধ বায়ুতে মোটামুটি হিসাবে এক ভাগ অক্সিজেন ও চার ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। মুক্ত বায়ুতে এই দুইটি গ্যাস ছাড়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, এবং আরও দুই একটি গ্যাস থাকে। কিন্তু ইহারা এত অল্প মাত্রায় থাকে যে তাহাতে স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয় না। এই জন্য মুক্ত বায়ুকেই বিশুদ্ধ বায়ু বলা চলে।

দূষিত বায়ুতে অক্সিজেন কিছু কম এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড কিছু বেশি থাকে ; নাইট্রোজেন বিশুদ্ধ বায়ুর মতই। ইহা ছাড়া

দূষিত বায়ুতে থাকে নানা রোগের বীজাণু ও পচাগলা জিনিসের দুর্গন্ধ গ্যাস।

শ্বাস-প্রশ্বাস—আমাদের বাঁচিবার ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় বিশুদ্ধ অক্সিজেনের। আর এই অক্সিজেন আমরা গ্রহণ করি বাতাস হইতে। তাই, বাতাস যত বিশুদ্ধ হইবে ততই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। বায়ু হইতে কিরূপে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। নাক-মুখ দিয়া প্রশ্বাসের সঙ্গে বায়ু আমাদের ফুসফুসে যাইয়া উহাকে ফুলাইয়া তোলে। তখন ফুসফুসের জালকের মধ্যে অক্সিজেন প্রবেশ করে এবং রক্ত হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড আসিয়া নিশ্বাসের সঙ্গে বাহিরে চলিয়া আসে। তাহা হইলে দেখিলে শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে একদিকে যেমন আমাদের দেহের রক্ত শোধিত হয় অন্যদিকে আবার বায়ু দূষিত হইয়া পড়ে।

বায়ু কিরূপে দূষিত হয়—রুদ্ধ গৃহে বাস করিলে শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে বায়ুর অক্সিজেন কমিয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাড়িতে থাকে ও বায়ু দূষিত হইয়া পড়ে। রুদ্ধ গৃহে আগুন জ্বালাইয়া রাখিলেও বায়ু দূষিত হয়, কারণ আগুন জ্বলিতে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়।

এক ঘরে অনেক লোক ভিড় করিয়া থাকিলেও অত-লোকের শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে ঘরের হাওয়া নষ্ট হয়। সিনেমা বা থিয়েটারের ঘরে এইরূপেই বায়ু দূষিত হয়।

জীবজন্তুর মৃতদেহ বা নর্দমার আবর্জনা পচিয়াও অনেক সময় বায়ু দূষিত হয়।

কোন শহরে কলকারখানা যদি খুব বেশি হয় তাহা হইলে শহরটির আকাশ ধোঁয়ায় ধোঁয়া হইয়া থাকিবে। আর এই ধোঁয়ার ভিড়ে শহরের বাতাস হইতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিবে। আমরা বলিব, শহরের বাতাস দূষিত হইয়াছে।

আবার বসন্ত, যক্ষ্মা প্রভৃতি কয়েকটি রোগ আছে যাহার বীজাণু বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায়। তাই এই জাতীয় রোগের প্রকোপ খুব বেশি হইলে বাতাসের ভিতর ভরিয়া যাইবে রোগের বীজাণু। ফলে, বায়ু হইবে দূষিত।

বায়ু কিরূপে শোধিত হয়—প্রখর সূর্যকিরণ রোগের বীজাণু নষ্ট করে, বৃষ্টির জল বাতাসের ধোঁয়া ও ধূলাবালি সরাইয়া উহাকে পরিষ্কার করে। কিন্তু কার্বন-ডাই-অক্সাইড কমাইয়া অক্সিজেনের পরিমাণ না বাড়াইলে তো বায়ু বিশুদ্ধ হইবে না। গাছপালারা এই অতি প্রয়োজনীয় কাজটি করিয়া দিয়া আমাদের সাহায্য করে।

তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ যে, গাছগাছড়ারা সবুজ পাতার ভিতরে খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য বাতাস হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস সংগ্রহ করে। এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর ভিতর রহিয়াছে কার্বন ও অক্সিজেন। খাবার প্রস্তুত করিবার জন্য গাছের সবুজ পাতা শুধু কার্বনটুকুই গ্রহণ করে এবং অক্সিজেনটুকু যেন আবর্জনা হিসাবে ফেলিয়া দেয়। ইহাতে আমাদের লাভ কতখানি তাহা ভাবিয়া দেখ। এই গাছপালা না থাকিলে ধীরে ধীরে পৃথিবীর বাতাস অক্সিজেনশূন্য হইয়া যাইত। সুতরাং দূষিত বায়ু শোধনের জন্য গাছপালার প্রয়োজন খুব বেশি। শহরে গাছপালা কম বলিয়া এখানকার

বায়ু শোধিত হইতে পারে না। তাই বিশেষ করিয়া শহরে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বৃক্ষরোপণ প্রয়োজনীয়।

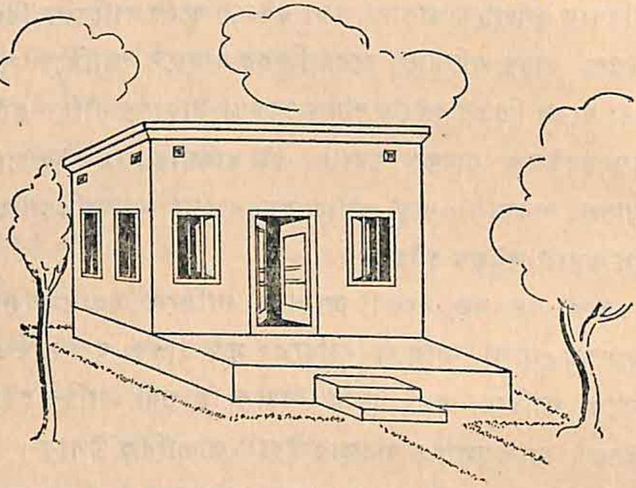
বায়ু চলাচল—তোমরা দেখিয়াছ, বন্ধ ঘরের বাতাস অতি সহজে নষ্ট হয়। তাই বন্ধ ঘরের ভিতরকার হাওয়াকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা ও যত্নের প্রয়োজন। এই বিশুদ্ধ করিবার ব্যাপারে প্রধান কথা হইল, ঘরের বাহিরের বিশুদ্ধ হাওয়া প্রচুর পরিমাণে ঘরের ভিতর যাহাতে আসিতে পারে এবং ঘরের ভিতর হইতে দূষিত হাওয়া যাহাতে বাহির হইয়া যায় সেইরূপ ব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থার নাম হইল বায়ু-চলাচল ব্যবস্থা। বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা না থাকিলে ঘরে বাস করাই কষ্টকর হইবে।

ঘরে বড় বড় দরজা জানালা থাকিলে এবং সেইগুলি যথাসম্ভব খোলা রাখিলে বাহিরের মুক্ত হাওয়া ঘরের ভিতর ঢুকিতে পারিবে এবং ঘরের বিষাক্ত হাওয়া বাহির হইয়া যাইবে। বায়ু চলাচল ব্যবস্থার ইহাই স্বাভাবিক উপায়।

কিন্তু সমস্ত ঘরেই বড় বড় দরজা জানালা করা এবং সেই সকল দরজা জানালা খুলিয়া রাখা সম্ভব হয় না। যেমন ধর, সিনেমা-থিয়েটারের ঘর। এই সকল ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়। ঘরের দেয়ালের উপর দিকে বড় বড় ঘুলঘুলি ফুটাইয়া সেইখানে একরকম বিদ্যুতের পাখা বা ফ্যান বসাইয়া দেওয়া হয়, ঐ পাখা ঘুরিবার সময় ঘরের ভিতরকার দূষিত হাওয়া টানিয়া বাহির করিয়া দেয়।

ইহা ছাড়া বাসগৃহাদিতে বায়ু চলাচলের জন্য একটি সহজ উপায় করা যাইতে পারে। ঘরের মেঝের কাছাকাছি এবং

কড়ি কাঠের কাছাকাছি, দুই জায়গাতেই ঘুলঘুলি ফুটাইয়া রাখা। নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে খারাপ হাওয়া বাহির হয় তাহা গরম থাকে। হাওয়া গরম হইলে হালকা হয়। হালকা হইলে তাহা উপরের ঘুলঘুলি দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। অপরপক্ষে বাহিরের ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকিবে নীচের ঘুলঘুলি দিয়া।



আদর্শ বাড়ি

আদর্শ বাড়ির চারিদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে, ঘরে বড় বড় রুজু-রুজু জানালা থাকিবে এবং দেওয়ালের উপর দিকে অনেকগুলি ঘুলঘুলি থাকিবে।

জল

জলের ধর্ম—জল একটি তরল পদার্থ। ইহা স্বচ্ছ। ইহার নির্দিষ্ট আকার না থাকিলেও আয়তন নির্দিষ্ট। জল নীচের

দিকে গড়াইয়া চলে। জল বহু জিনিসকে গলাইতে পারে। জল ঠাণ্ডায় বরফ হয়, গরমে বাষ্প হয়।

জলের প্রয়োজনীয়তা—জল পান না করিলে আমরা বাঁচিতে পারি না। শুধু তাহাই নহে। স্নান করা, কাপড় কাঁচা, বাসন মাজা প্রভৃতি নানা কাজের জন্যও জলের দরকার।

জল পান না করিলে আমরা খাদ্য হজম করিতে পারিতাম না। ইহা ছাড়া আমরা যে জল পান করি তাহা আমাদের শরীরের ভিতরটি ধুইয়া মূত্র ও ঘর্মরূপে শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। ইহা না হইলে আমাদের শরীরের ভিতরটিতে নোংরা জমিয়া তাহা বিষাক্ত হইয়া উঠিত।

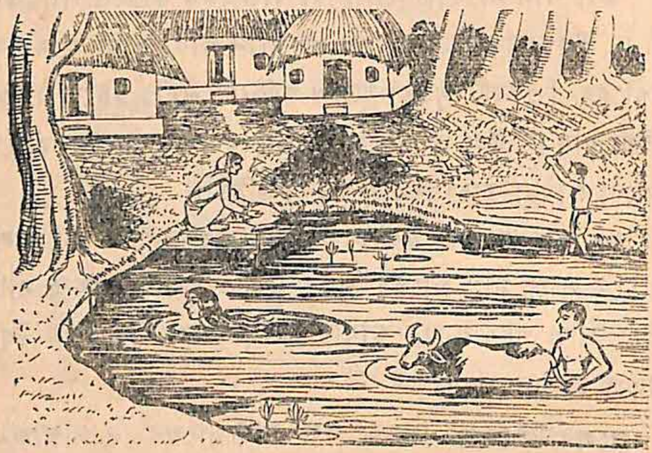
শুধু আমরা কেন, জল ছাড়া কোন পশুপক্ষী বা গাছপালা বাঁচিতে পারে না। গাছের শিকড় এই জলের সাহায্যেই মাটি হইতে খাদ্য গ্রহণ করে, আবার এই জলের সাহায্যেই উহা পাতায় চালান দেয়।

জলের উপাদান—বিশুদ্ধ জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুইটি গ্যাসের রাসায়নিক সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়। ইহা স্বাদহীন ও বর্ণ-গন্ধ হীন। কিন্তু এই জল শুধু কারখানায়ই প্রস্তুত করা চলে। পুকুর-নদী, খাল-বিলে আমরা যে প্রাকৃতিক জল পাই তাহাতে নানারূপ লবণ ও খনিজ পদার্থ মিশিয়া থাকে। সেই সকল খনিজ পদার্থের মধ্যে অনেকগুলি আমাদের শরীরের পক্ষে উপকারী। এই জলের নিজস্ব স্বাদও আছে।

জল কিরূপে দূষিত হয়—অনেক সময় জলের সহিত নানা প্রকার নোংরা জিনিস মিশিয়া জলকে দূষিত করে। পচা পাতা,

নানা প্রকার আবর্জনা ও কয়েকটি মারাত্মক রোগের বীজাণুই ইহার মধ্যে প্রধান। আবার কোন কোন বিষাক্ত লবণও জলের সহিত মিশিয়া জল খারাপ করে।

পুকুরের জল নানা কারণে খারাপ হইতে পারে। পাড় বাঁধান না থাকিলে বৃষ্টির জল নানা আবর্জনা আনিয়া ফেলে



পুকুরের জল দূষিত হইতেছে

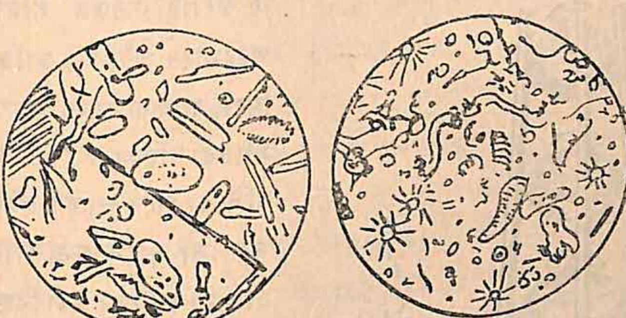
পুকুরে। পাড়ে গাছ বা ঝোপ-জঙ্গল থাকিলে উহার পাতা পড়িয়া পচিয়া জল নষ্ট করে। তাছাড়া জলে নামিয়া স্নান করিলে, গরু-মহিষ স্নান করাইলে, বাসন মাজিলে, কাপড় কাচিলে, কাছে মল-মূত্র ত্যাগ করিলে পুকুরের জল নষ্ট হয়।

দূষিত জলের দরুন অসুখ বিসুখ—কলেরা, টাইফয়েড় আমাশয় প্রভৃতি রোগ জলের দ্বারা সংক্রামিত হয়। আমাদের অসাবধানতার ফলেই এই সব রোগের বীজাণু জলের সঙ্গে

মিশে। আর ইহা না জানিয়া সেই জল যে পান করে তাহারই রোগ হয়।

যে জলে বিষাক্ত লবণাদি গলিত অবস্থায় আছে তাহা পান করিলে সাধারণত বমন, উদরাময় বা কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ হইতে পারে।

দূষিত জল শোধন করিবার উপায়—জল দূষিত হইলে অবশ্যই তাহা শোধন করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু যে সব জলাশয়ের জল আমরা ব্যবহার করিব তাহা যাহাতে নষ্ট না



নোংরা জলের মধ্যে বীজাণু

হইতে পারে সেই ব্যবস্থাই আগে করা প্রয়োজন। যে সব কারণে পুকুরের জল খারাপ হয় তাহা তোমরা জান। সেই সব বিষয়ে সাবধান হইলে জলও সহজে নষ্ট হইবে না।

কূপ বা পুকুরের জল দুই রকমে শোধন করা যায়। এক, কূপ বা পুকুরের সম্পূর্ণ জলকেই শোধন করিয়া লওয়া। দুই, জল ঘরে আনিয়া তাহা পান করিবার পূর্বে শোধন করিয়া লওয়া।

পুকুরের ভিতর হইতে পানা, পচা পাতা ইত্যাদি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। পাঁক থাকিলে তাহাও উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। তারপর জলে ব্লিচিং পাউডার বা পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট মিশাইয়া দিলে জল পরিষ্কার হইবে।

এইবার দেখা যাক, কূপ, পুকুর বা নদী হইতে জল তুলিয়া আনিবার পর তাহা কিরূপে শোধন করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে জলকে ভাল করিয়া ফুটাইয়া লওয়া দরকার। জল ফুটাইলে তাহার ভিতরকার বীজাণু মরিয়া যায়। তাহার পর ঐ জলের ভিতর সামান্য পরিমাণে ফটকিরি ছাড়িয়া দিলে জলের ময়লা পাত্রের নীচের দিকে থিতাইয়া বসিবে। পরে পাত্রটি হইতে জল সাবধানে অন্য পাত্রে ঢালিয়া লইবে। জল বিশুদ্ধ করিবার এইটিই সবচেয়ে সহজ উপায়। কিন্তু ইহা ছাড়া ফিল্টারের সাহায্যেও জল শোধন করা যাইতে পারে।

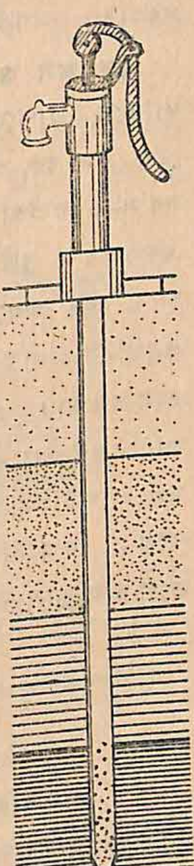


ফিল্টার



ইচ্ছা করিলে নিজেরাও ঘরে ফিল্টার তৈয়ারী করিয়া নিতে পার। একটি কাঠের কাঠামোর মধ্যে উপরি উপরি চারটি হাঁড়ি বসাইয়া দাও এবং সব চেয়ে নীচের হাঁড়িটি ছাড়া বাকী তিনটির তলায় ছোট ফুটা করিয়া দাও। ফুটার মধ্যে ন্যাকড়ার

শলতে পাকাইয়া লাগাইয়া দাও; তাহা হইলে উপরের হাঁড়ির জল ফোঁটা ফোঁটা হইয়া নীচের হাঁড়িতে পড়িবে। উপর হইতে দ্বিতীয় হাঁড়ির ভিতর রাখ কাঠকয়লা এবং তৃতীয় হাঁড়ির ভিতর রাখ বালি। তাহার পর, জল ফুটাইয়া উপরের হাঁড়ির ভিতরে সাবধানে ঢালিয়া দাও। এর পর প্রথম হাঁড়ি হইতে ফোঁটা ফোঁটা ভাবে বাহির হইয়া জল দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাঁড়ির ভিতর দিয়া নীচের হাঁড়িতে পৌঁছিবে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হাঁড়ির কাঠকয়লা ও বালির ভিতর দিয়া আসিবার সময় জল পরিষ্কার হইয়া যাইবে।



নলকূপ

নলকূপ – পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ জল পাইবার আর একটি উপায় হইল নলকূপ বসানো। সীসার ফাঁপা নল একটির পর একটি জোড়া দিয়া যন্ত্রের সাহায্যে সোজা অনেক মাটির নীচ পর্যন্ত ঢুকাইয়া দিতে হয়। তারপর নলের মুখে একটি পাম্প বসাইয়া লইলেই নলকূপ হইল। নলকূপের জল আসে মাটির একেবারে গভীর স্তর হইতে। মাটির অত নীচে বীজাণু বা নোংরা জিনিস থাকা সম্ভব নহে। প্রত্যেক ঘরে ঘরে নলকূপ বসানো সম্ভব না

হইলেও গাঁয়ে গাঁয়ে ও পাড়ায় পাড়ায় একটি করিয়া নলকূপ বসানো একান্ত প্রয়োজন। তবে নলকূপ খুব গভীর হওয়া দরকার। অগভীর নলকূপের জল নষ্ট হইয়া পড়িতে পারে।

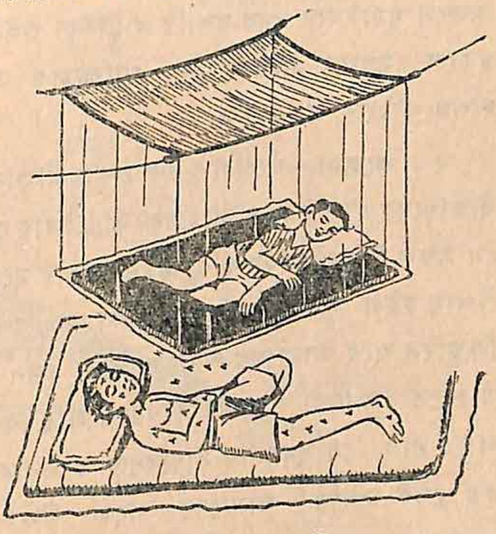
মৃদু জল ও খর জল—তোমরা হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, কাপড়ে সাবান লাগাইতে গেলে কোন কোন সময় বেশ ফেনা হয়, আবার কখনো বা ফেনা হইতেই চায় না। সব সময় যে ইহা সাবানের দোষে হয় তা নয়। জলের দোষেও এরূপ হয়। বৃষ্টি বা নদীর জলে সাধারণতই বেশ ফেনা হয়। এই জলকে বলে **মৃদু** জল। আবার যে সব জলে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম-ঘটিত লবণ থাকে তাহাতে ফেনা ভাল হয় না। এই জলকে বলে **খর** জল। এই খর জল আবার দুই রকমের—অস্থায়ী খর ও স্থায়ী খর। অস্থায়ী খর জলকে ফুটাইয়া বা চুন মিশাইয়া লইলেই উহা মৃদু হইয়া পড়ে। কিন্তু স্থায়ী খর জলকে মৃদু করা অতি কষ্টকর। মৃদু জলে চাল-ডাল ভাল সিদ্ধ হয়, খর জলে ভাল সিদ্ধ হয় না।

কয়েকটি রোগের কথা

১। **ম্যালেরিয়া** - ম্যালেরিয়া রোগ চিনে না এমন লোক বোধ হয় বাংলাদেশে নাই। শীতে কাঁপাইয়া এই জ্বর বাড়িতে থাকে, তারপর আবার শরীর ঘামাইয়া জ্বর ছাড়িয়া যায়। প্লীহা ও যকৃৎ বাড়িয়া রোগীর পেটটি বড় হয়, শরীর শুকাইতে থাকে ও রক্তহীন হইয়া পড়ে। এই রোগের কারণ আসলে এক জাতীয় বীজাণু। সেই বীজাণুরা আমাদের রক্তের মধ্যে

একবার প্রবেশ করিতে পারিলে তাহাদের সংখ্যা হুড়হুড় করিয়া বাড়িয়া যায় এবং রক্তের মধ্যে তাহারা যে-সকল উৎপাত শুরু করে, তাহারই দরুন আমাদের দেহে রোগের নানা লক্ষণ ফুটিয়া উঠে।

কিন্তু, ইহারা কিরূপে আমাদের রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে? স্ত্রী-অ্যানোফিলিস মশা ইহার জন্য দায়ী। তাহারা ম্যালেরিয়ার রোগীর শরীর হইতে রক্ত শোষণ করিবার সময় রক্তের সহিত ম্যালেরিয়ার বীজাণু শুষিয়া লয় এবং তার পর সুস্থ মানুষের শরীরে বসিয়া দংশন করিবার সময় তাহার শরীরের মধ্যে ঐ বীজাণু চালান করিয়া দেয়।



মশারির প্রয়োজনীয়তা

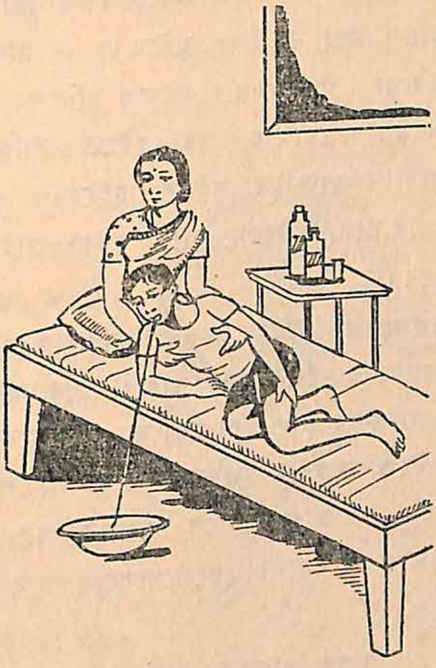
তাহা হইলে, ম্যালেরিয়ার হাত হইতে নিজেদের বাঁচাইবার উপায় কি? উপায় প্রধাণত দুই প্রকার। এক হইল, এই জাতীয় মশাদের ধ্বংস করিবার চেষ্টা করা এবং দ্বিতীয়ত, যাহাদের ধ্বংস করা সম্ভব হইল না তাহারাও যাহাতে আমাদের দংশন করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা। এঁদো ডোবা

ঝোপঝাড়, নোংরা পাত্রের পচা জল প্রভৃতির মধ্যেই এই জাতীয় মশাদের আড্ডা। সেগুলি বন্ধ করিয়া দিলে বা পরিষ্কার করিয়া ফেলিলে বা মাঝে মাঝে কেরোসিন তেল ছড়াইয়া দিলে ইহাদের আড্ডাও নষ্ট হইয়া যাইবে। তাই পানা পুকুর সাফ করা এবং এঁদো ডোবা প্রভৃতির দিকে বিশেষ করিয়া নজর রাখা দরকার। দ্বিতীয়, ম্যালেরিয়া অঞ্চলে ঘুমাইবার সময় মশারি খাটাইয়া শুইতে হইবে। তাহা হইলে, সেখানে এইরূপ মশা থাকিলেও তাহারা আমাদের দংশন করিতে পারিবে না।

২। **কলেরা**—কলেরাও একপ্রকার বীজাণুর দরুন হয়। এই বীজাণুদের হাত হইতে আমাদের বাঁচাইবার জন্য বৈজ্ঞানিকরা যে সকল উপায় বাহির করিয়াছেন তাহার মধ্যে একটি আশ্চর্য উপায় হইল আগে থাকিতে টিকা লওয়া। টিকা লইবার কিছুদিন পরে আমাদের শরীরের মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহাতে বীজাণুরা আক্রমণ করিয়াও আর কোন ক্ষতি করিতে পারে না। যে সময়টায় সাধারণত কলেরার প্রকোপ শুরু হয় সেই সময়ে আমাদের পক্ষে টিকা লওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

তাছাড়াও মনে রাখিতে হইবে, কলেরা রোগীর দারুন ভেদ বমি হয় এবং রোগীর বমি, মল ও মূত্রের মধ্যে থাকে কলেরার বীজাণু। এখন যদি মাছি আসিয়া বসে এই সবের উপর–মাছিটার গায়ে নিশ্চয়ই অনেক বীজাণু মাখামাখি হইয়া যাইবে। সেই মাছি যদি কোন খাবারের উপর বসে তাহা হইলে মাছিটার শরীর হইতে খাবারের মধ্য চলিয়া যাইবে

বীজাণুর দল। সেই খাবার যে খাইবে তার পেটের মধ্যেও ঢুকিয়া পড়িবে অজস্র কলেরার বীজাণু। কিংবা ধর, কলেরা রোগীর নোংরা কাপড়-চোপড় পুকুরের জলে কাচা হইল—



কলেরা-রোগী

কাপড়-চোপড়ের নোংরা হইতে নিশ্চয়ই বীজাণুর দল পুকুরের জলে মিশিবে। এই জল যে পান করিবে তাহার নিশ্চয়ই কলেরা হইবার খুব সম্ভাবনা থাকিবে।

কাজেই, গ্রামে বা পাড়ায় কাহারো কলেরা হইলে কতকগুলি বিষয়ে সাবধান হওয়া দরকার—

প্রথমত, খাবার ঢাকিয়া রাখা উচিত। দ্বিতীয়ত, পানীয় জল ফুটাইয়া নেওয়া দরকার। তৃতীয়ত, রোগীর নোংরা কাপড়-চোপড় পুকুরে কাচা একেবারেই উচিত নয়। এসব পোড়াইয়া ফেলা ভাল, নয়ত ঔষধে ভিজাইয়া ফুটাইয়া নিরাপদ স্থানে নিয়া কাচিতে হইবে। যাঁহারা রোগীর শুশ্রূষা করিবেন তাঁহাদের পক্ষেও বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। রোগীর ঘর হইতে বাহির হইয়া কার্বলিক সাবানে হাত-মুখ ধুইতে হইবে। যে কাপড় পরিয়া রোগীর ঘরে যাইবেন, বাহির হইয়া তাহা ছাড়িয়া ফেলিতে হইবে।

৩। **টাইফয়েড**—টাইফয়েড একটি মারাত্মক রোগ। ইহাও ছোঁয়াচে এবং ইহার মূলেও একপ্রকার বীজাণু। এই বীজাণুরা অন্ত্রের উপর আক্রমণ চালাইয়া উহাকে কাবু করে। ফলে প্রথমে জ্বর হইতে থাকে, জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না, শেষে পেটের অসুখ করে। এই জন্যে ইহাকে আন্ত্রিক জ্বর বলা হয়। ১৪ হইতে ২৪ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের পক্ষে এই রোগ বেশি মারাত্মক।

দুধ, জল ও খাবার দাবারের সঙ্গে এই রোগের বীজাণু সুস্থ লোকের শরীরে প্রবেশ করে। তাই আশে পাশে কাহারও টাইফয়েড হইলে জল ও দুধ খুব ভাল করিয়া ফুটাইয়া খাওয়া দরকার। খাবার জিনিসপত্র ঢাকিয়া রাখিতে হইবে যাহাতে উহাতে মাছি বসিতে না পারে। যাঁহারা রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিবেন তাঁহারা জীবাণুনাশক ঔষধে হাতমুখ না ধুইয়া কাহারও সহিত মিশিবেন না।

টাইফয়েডেরও প্রতিষেধক টিকা আছে। অনেক সময় কলেরা ও টাইফয়েড এই দুইটি রোগের প্রতিষেধক একত্রে মিশাইয়া একই টিকা ব্যবহার করা হয়।

৪। **বসন্ত**—অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক ও বীভৎস এই রোগ। আর তাছাড়া, রোগটা ভয়ানক রকম ছোঁয়াচে। ইহারও আসল কারণ এক জাতীয় বীজাণু। কোন রূপে বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিলে প্রথমে জ্বর হয়, শরীর ব্যথা হয় এবং গায়ে অনেক গুটি বাহির হয়। এই গুটিগুলি পাকে, ঘা হয় ও শেষে শুকাইতে আরম্ভ করে। এই গুটি হইতেই রোগের বীজাণু আশেপাশের বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে এবং প্রশ্বাসের সঙ্গে সুস্থ লোকের শরীরে প্রবেশ করে। সারিয়া উঠিবার মুখে গায়ের গুটি শুকাইয়া যখন খোলস উঠিতে থাকে তখনই ছোঁয়াচের ভয়টা বেশি।



বসন্ত-রোগী

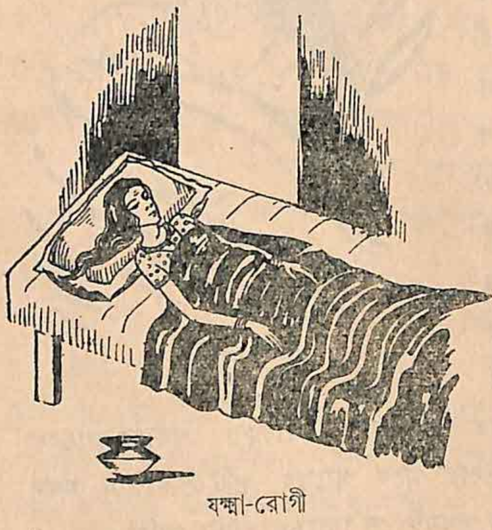
বসন্ত রোগীকে একটি আলাদা ঘরে রাখিতে হইবে। মশারি ব্যবহার করিতে হইবে। যাঁহারা রোগীর পরিচর্যা

করিবেন তাঁহারা ছাড়া আর কেহ রোগীর ঘরে যাইবেন না। রোগীর নিকটে যাইতে নাকে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া লওয়া ভাল।

রোগী একেবারে সম্পূর্ণ ভাবে সারিয়া উঠিবার আগে তাহাকে বাহির হইতে দেওয়া উচিত নয়। রোগীর নোংরা কাপড়-চোপড় পোড়াইয়া ফেলা ভাল।

বসন্তের টিকা এই রোগের উত্তম প্রতিষেধক।

৫। **যক্ষ্মা**—যক্ষ্মাও একটি ছোঁয়াচে রোগ। ইহার মূলেও এক রকম বীজাণু। এই বীজাণুরা ফুসফুস আক্রমণ করিয়া উহাতে ঘা করিয়া ফেলে। রাত্রিতে একটু একটু জ্বর হওয়া, সব সময় কাশি, কাশির সঙ্গে রক্ত পড়া, শরীর শুকাইয়া যাওয়া প্রভৃতি যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ।



যক্ষ্মা-রোগী

নানা কারণে শরীর দুর্বল হইয়া পড়িলে পরই এই বীজাণুরা আমাদের কাবু করিতে পারে। কাজেই যে সব কারণে আমাদের শরীর দুর্বল ও এই বীজাণুর সামনে প্রায় অসহায়

হইয়া পড়িতে পারে সেই কারণগুলি সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। সেই কারণগুলি কি? প্রথমত, উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। দ্বিতীয়ত, অত্যধিক পরিশ্রম। তৃতীয়ত, একটানা কোন রোগে ভোগা - যেমন ধর, দীর্ঘ দিন ধরিয়া ম্যালেরিয়ায় ভুগিলে শরীরের শক্তি খুব কমিয়া যায়। চতুর্থত, উপযুক্ত আলো-বাতাসের অভাবে দিন কাটানো। ঘুপচী আর নোংরা ঘরে একটানা দিন কাটাইলে শরীর অবসন্ন ও দুর্বল হইয়া পড়ে। তাই যক্ষ্মার সম্ভাবনা হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্য এই কয়টি দিকে বিশেষ করিয়া নজর রাখিতে হইবে। তাছাড়া অবশ্যই চেষ্টা করিতে হইবে, যক্ষ্মার বীজাণু যাহাতে আমাদের শরীরে প্রবেশ করিতে না পারে। যক্ষ্মার বীজাণুরা সাধারণত রোগীর কফ আর থুথুর ভিতর দিয়াই চারিদিকে ছড়াইতে থাকে। তাই, প্রথম ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে রোগীরা যেখানে-সেখানে থুথু না ফেলেন। একটা কোন পাত্রে বীজাণু-নাশক ঔষধ রাখিয়া তাহার মধ্যেই রোগী থুথু ফেলিবেন। রোগীর এঁটো খাবার কিছুতেই যেন অন্য কেউ না খান, এমন কি রোগীর খাবার-দাবারের পাত্রগুলিও যেন সম্পূর্ণভাবে আলাদা করিয়া রাখা হয়।

সম্প্রতি যক্ষ্মা রোগের প্রতিষেধক হিসাবে বি. সি. জি. টিকার প্রচলন হইয়াছে।

৬। **খোস-পাঁচড়া**—খোস-পাঁচড়া, দাদ ইত্যাদি কয়েক রকম অসুখ দেখা দেয় চামড়ার উপরে। এইগুলি একরকম চর্মরোগ। এইসব রোগেরও বীজাণু আছে এবং ইহারাও

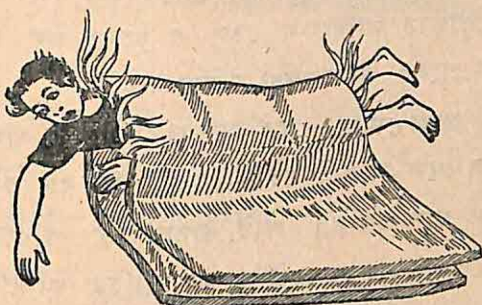
ছোঁয়াচে। এই জাতীয় রোগ মারাত্মক না হইলেও খুবই নোংরা আর অস্বস্তিকর। সাধারণত, রোগীর ব্যবহৃত গামছা-তোয়ালে বা জামা-কাপড় হইতেই এই রোগের বীজাণুরা সুস্থ লোকের শরীরে চালান হয়। তাছাড়া যদি কেহ খোস পাঁচড়া ইত্যাদি চুলকাইয়া ভাল করিয়া হাত না ধুইয়া সেই হাত অন্য কাহারও গায়ে দেয় তাহা হইলেও এই রোগ অন্যের চামড়ায় সংক্রামিত হইতে পারে। তাই যাহার খোস-পাঁচড়া বা দাদ হইয়াছে তাহার জামা-কাপড়, গামছা তোয়ালে, বিছানা ইত্যাদি সবই একেবারে আলাদা করিয়া ফেলিতে হইবে।

প্রাথমিক প্রতিবিধান

হঠাৎ এমন আপদ বিপদ কখনো ঘটিতে পারে যখন খুব তাড়াতাড়ি উহার প্রতিকার না করিলে সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। কিন্তু ডাক্তারকে তো আর সব সময় খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় না, তাই ডাক্তার আসিয়া না পৌঁছা পর্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া এমন কিছু করিবার চেষ্টা করিবে যাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনা কমিয়া যায়। তাই, এই সব হঠাৎ-ঘটা দুর্ঘটনায় প্রাথমিক প্রতিবিধানের নিয়ম কানুন প্রত্যেকেরই জানিয়া রাখা উচিত।

১। **কাপড়-চোপড়ে আগুন লাগা**—কাহারো জামা-কাপড়ে হঠাৎ যদি আগুন লাগিয়া যায় তবে ভয়ে হতবুদ্ধি না হইয়া তাড়াতাড়ি আগুন নিবাইতে চেষ্টা করিবে।

যাহার জামা-কাপড়ে আগুন ধরিয়াছে সে ভয়ে চিৎকার করিতে করিতে পাগলের মত ঘরময় ছুটাছুটি করিতে চাহিবে। কিন্তু এক্ষেত্রে দৌড়াদৌড়ি করিলে সর্বনাশ হইবে; কারণ হাওয়া লাগিয়া আগুন আরও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। কাজেই আগুন লাগিলে ছুটাছুটি করা একেবারে নিষেধ, একথা সব সময় মনে রাখিও। তবে কি করিবে? আগুন যদি কম থাকে, তবে আগুন-লাগা জামা বা কাপড়টি টানিয়া ছিঁড়িয়া শরীর হইতে আলাদা করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিবে। তাহা সম্ভব না হইলে ছুটাছুটি না করিয়া মাটিতে দুই একবার গড়াগড়ি দিলে আগুন নিবিয়াও



আগুন নিবান

যাইতে পারে। আগুন যদি বেশি হয় তবে সতরঞ্চি, কম্বল, লেপ, তোশক প্রভৃতি ভারী জিনিস হাতের কাছে যাহা পাওয়া যাইবে তাহা দিয়া জ্বলন্ত স্থানটি চাপিয়া ধরিবে। এইভাবে কোন পুরু জিনিস দিয়া চাপা দিলে হাওয়ার অভাবে আগুন আর জ্বলিতে পারিবে না।

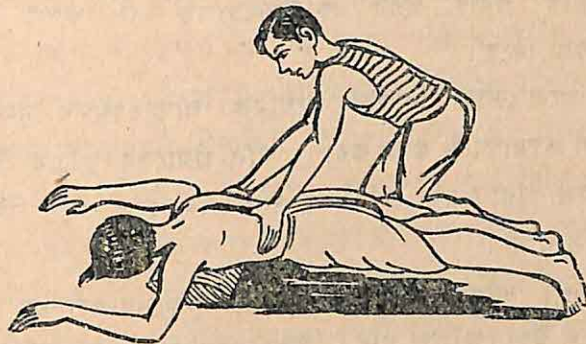
আগুন নিবাইবার পর কি করিতে হইবে? পোড়া জায়গাটা পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু খুব সাবধানে পরিষ্কার করিতে হইবে। যদি পোড়ার দরুন গায়ে ফোস্‌কা পড়িয়া যায়, তাহা হইলে দেখিবে সেই ফোস্‌কা যেন ছিঁড়িয়া না যায়। দ্বিতীয়ত, যদি দেখ পোড়া কাপড় গায়ের চামড়ার সঙ্গে আঁটিয়া গিয়াছে তাহা হইলে টানাটানি করিয়া তাহা তুলিবার চেষ্টা করিবে না। কাঁচি দিয়া কাপড়টার আশপাশ কাটিয়া দাও, আর যেখানে যেখানে চামড়ার সঙ্গে কাপড় লাগিয়া গিয়াছে সেই সব স্থানে কাপড়টাকে ঐ ভাবেই থাকিতে দাও। তারপর পোড়া জায়গাটাকে খুব সাবধানে আর আলগা ভাবে পরিষ্কার কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দাও। সামান্য পোড়ায় নারিকেল তেল ও চুনের জল ভালরূপে মিশাইয়া প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা কমিয়া যায়।

২। **জলে-ডোবা**—কেহ জলে ডুবিয়া গেলে তাহার পেট ও ফুস্‌ফুস্ জলে বোঝাই হইয়া যায়, আর বন্ধ হইয়া যায় স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস। তাই, প্রথম চেষ্টা করিতে হইবে তাহার পেট ও ফুস্‌ফুস্ হইতে জল বাহির করিতে; আর তারপর চেষ্টা করিতে হইবে কৃত্রিম উপায়ে তাহার স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে।

প্রথমে দেখ মুখের মধ্যে ময়লা জমিয়াছে কিনা। আঙুল দিয়া ময়লাটা পরিষ্কার করিয়া দাও, তারপর তাহাকে উপুড় করিয়া শোয়াও। বুকের নীচে একটা বালিশ দিও, তাহা হইলে মাথাটা মাটির দিকে ঝুলিয়া পড়িবে। তারপর তার হাত দুইটিকে মাথার দুইদিকে রাখিয়া বুকের দুইপাশ চাপিয়া

ধরিয়া বার কতক নাড়া দাও। ইহাতে তাহার পেটের ও ফুস্‌ফুসের জল অনেকটা বাহির হইয়া যাইবে।

এইবার তাহাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া কাঁধের নীচে বালিশ দাও এবং অন্য একজনকে বল একপাশে বসিয়া রুমাল দিয়া



জল বাহির করার উপায়

রোগীর জিভটা টানিয়া ধরিতে। তারপর তুমি রোগীর মাথার পিছনে বসিয়া তাহার দুই হাতের কব্জিতে ধর এবং ঝাঁকি দিয়া হাত দুইটি উপরের দিকে উঠাইয়া একেবারে মাথার দুইপাশে



কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের উপায়

লইয়া আইস। ইহাতে ফুস্‌ফুসে হাওয়া ঢুকিবে। তারপর তার হাত দুটিকে উঠাইয়া কনুইর কাছে ভাঙ্গিয়া বুকের উপর রাখ ও চাপ দাও। এই চাপে ফুস্‌ফুস্ হইতে হাওয়া বাহির

হইয়া যাইবে। প্রতি মিনিটে ১২।১৪ বার করিয়া এইরূপ করিতে হইবে। ক্রমাগত এই রকম করিতে থাকিলে আস্তে আস্তে তাহার স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরিয়া আসিবে। শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরিয়া আসিলে রোগীর শরীর গরম কাপড়-চোপড় বা কম্বল দিয়া ঢাকিয়া দিবে।

জলে ডোবা রোগীর প্রাথমিক প্রতিবিধানের মূল মন্ত্র হইল তাড়াতাড়ি কাজ করা। শ্বাস-প্রশ্বাসের কৃত্রিম উপায় আরম্ভ করিতে যদি দেরি কর তবে হয়ত শ্বাস আর ফিরিয়া আসিবে না।

৩। **পাগলা কুকুরে কামড়ানো**—কুকুরের জলাতঙ্ক রোগ হইলে উহা ক্ষেপিয়া যায়। উহা তখন জল খাইতে পারে না, চোখ ছুইটা কোটর হইতে যেন বাহির হইয়া আসিতে চায়, মুখ দিয়া লালা পড়িতে থাকে, লেজ নুইয়া পড়ে। সে তখন পাগলের মত ছুটাছুটি করে এবং যাহাকে সামনে পায় তাহাকেই কামড়ায়। এই পাগলা বা জলাতঙ্ক-গ্রস্ত কুকুর মানুষকে কামড়াইলে মানুষেরও এই রোগ হয়। অত্যন্ত বীভৎস এই রোগ এবং ইহার পরিণাম ভয়াবহ মৃত্যু। লুই পাস্তুর এই রোগের চিকিৎসা আবিষ্কার করিয়াছেন। সাধারণত হয় কি, পাগলা কুকুরে কামডাইলে বেশ কিছুদিন পরে মানুষের শরীরে এই রোগের লক্ষণ ফুটিয়া ওঠে। এই সময়ের মধ্যে যদি আক্রান্ত মানুষের শরীরে কয়েক দফায় পাস্তুরের আবিষ্কৃত ঔষধ ঢুকাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে এই জলাতঙ্ক রোগের আক্রমণ হইতে তাহাকে বাঁচানো যায়। পাস্তুরের এই চিকিৎসা আজকাল

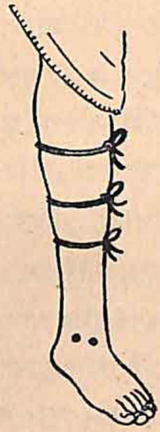
পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই প্রচলিত হইয়াছে। আমাদের দেশেও এই রকম চিকিৎসা-কেন্দ্র আছে।

কুকুরে কামড়াইলে প্রথমেই কামড়ের জায়গায় টিঞ্চার-আয়োডিন বা কার্বলিক এসিড জাতীয় কোন ঔষধ লাগাইয়া দিবে। তারপর লক্ষ্য করিবে কুকুরটা পাগলা কিনা। জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিবে। পাগলা হইলে কুকুরটি দুই একদিনের মধ্যে মরিয়াও যাইবে। যদি দেখা যায় কুকুরটা পাগলাই তবে কালবিলম্ব না করিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিকে পাস্তুর-চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠাইয়া দিবে।

৪। **সাপে কাটা**—সাপের ছোবল মারাকে চলতি কথায় সাপে কাটা বলে। সাপ দুই রকমের—নির্বিষ আর বিষধর। নির্বিষ সাপে ছোবল মারিলে অবশ্য তেমন ভয়ের কিছু নাই—কামড়ের জায়গাটায় টিঞ্চার-আয়োডিন জাতীয় ঔষধ লাগাইয়া দিলেই চলে। কিন্তু বিষধর সাপে কামড়াইলে ভয়ানক বিপদ, সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক প্রতিবিধান না করিলে প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে। সাপটা বিষধর কিনা তাহা জানিতে পারিলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করা চলে। বিষধর সাপের মুখের মধ্যে দুইটি করিয়া বিষদাঁত থাকে, আর তার উপর দিকে চোখের নিচ বরাবর থাকে বিষের থলি। নির্বিষ সাপের মুখের মধ্যে এ-সব নাই। কাজেই কাহাকেও সাপে কাটিলে কামড়ের দাগটা পরীক্ষা করিবে। নির্বিষ সাপে কামড়াইলে কামড়ের জায়গায় পাশাপাশি অনেকগুলি ছোট ছোট দাগ দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু বিষধর সাপে কামড়াইলে অনেকগুলি ছোট ছোট দাগের বদলে দুইটি বেশ

মোটা আর গভীর দাগ পড়িবে—দাগ দুইটির মাঝে একটু খানি ফাঁক। অবশ্য এই মোটা দাগদুইটির নীচে আরও দুইটি ছোট দাগ থাকিতে পারে। সাপ যদি বিষধর হয় তবে ছোবলের জায়গাটাও অল্পক্ষণের মধ্যেই ফুলিয়া ওঠে আর বেদনায় অবশ হইয়া আসে।

এইবার দেখ, সাপে ছোবল মারার সঙ্গে সঙ্গে কি করিতে হইবে। প্রথম যে-কাজটি করিবে চলতি কথায় তাহাকে বলে **তাগা বাঁধা**, অর্থাৎ ছোবলের জায়গার চার আঙুল উঁচুতে সরু দড়ি কিম্বা কাপড়ের পাড় দিয়া খুব জোরে বাঁধিয়া ফেল। তার-পর এই তাগাটার চার আঙুল উঁচুতে আরও একটি বা দুইটি তাগা বাঁধিবে। এমন জোরে বাঁধিবে যেন সেখানকার রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। তাগা বাঁধিতে কিন্তু একটুও দেরি করিবে না—সাপটা নির্বিষ না বিষধর তাহা বিচার করিবার আগেই তাগা বাঁধিবে। তারপর যদি দেখা যায় যে সাপটা বিষধর, তবে ছোবলের জায়গাটা ছুরি দিয়া চিরিয়া পটাস পারমাঙ্গানেট লাগাইয়া বিযাক্ত রক্ত বাহির করিতে চেষ্টা করিবে। ছোবলের জায়গায় গরম জল ঢালিলেও রক্ত বাহির হইবে। প্রথমটায় কালো আর জমাট বাঁধা রক্ত বাহির হইবে, তারপর ক্রমশ তাজা লাল রক্ত বাহির হইতে থাকিলে বুঝিবে বিষ রক্তের সঙ্গে বাহির হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাগাটা কিছুতেই খুলিয়া ফেলিবে না। ডাক্তার পরীক্ষা



তাগা বাধা

করিয়া তাগা খুলিতে বলার আগে উহা খুলিয়া ফেলা মারাত্মক ভুল হইবে।

৫। **কীট-পতঙ্গের কামড়**—ভিমরুল, বোলতা বা মৌমাছি হুল ফুটাইলে প্রথমে ছুরি বা অন্যকিছু দিয়া হুলটি বাহির করিবে। পরে অ্যামোনিয়া বা সরিষার তৈল, বা কেরোসিন তৈল লাগাইলে যন্ত্রণা কমিয়া যাইবে। কিছু খাওয়ার-সোডা অল্প জলে মিশাইয়া লাগাইয়া দিলেও জ্বালা যন্ত্রণা কমে।

কাঁকড়া-বিছায় কামড়াইলে একটু গরম জলে নুন মিশাইয়া উহা দ্বারা কামড়ান জায়গাটা কয়েকবার ধুইয়া দাও। স্পিরিট বা অ্যামোনিয়া লাগাইলেও যন্ত্রণা কমিয়া যাইবে।

৬। **আঘাত লাগা**—ট্রাম বাস হইতে, বা গাছ হইতে, বা হোঁচট লাগিয়া পড়িয়া গিয়া হাত পা মচকাইয়া বা হাড় ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। হাড় ভাঙ্গিয়াছে সন্দেহ হইলে তুমি নিজে ভাঙ্গা অঙ্গটিকে কখনও টানাটানি করিতে যাইও না; অভিজ্ঞ চিকিৎসক তাহার ব্যবস্থা করিবেন। তুমি কিছু করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইতে পারে। তোমার চেষ্টা হইবে, আহত লোকটি যাহাতে ছটফট করিয়া বা নাড়াচাড়া করিয়া নিজের আঘাতটা আরো বাড়াইয়া না তোলে সেদিকে নজর রাখা। তাই তাহাকে যতটা আরামে ও শান্ত ভাবে শোয়াইয়া রাখা যায় তার চেষ্টা করিবে। আর বেচারা যাহাতে খুব বেশি ঘাবড়াইয়া না যায় সে চেষ্টাও করিবে।

যদি মাথায় খুব চোট লাগিয়া কেহ অজ্ঞান হইয়া যায় তবে তাহার চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিবে, আর চেষ্টা করিবে আশপাশ হইতে ভিড় যথাসম্ভব সরাইয়া দিতে।

৭। **কোন স্থান কাটিয়া রক্ত পড়া**—শরীরের কোন জায়গা কাটিয়া রক্ত পড়িতে থাকিলে তাড়াতাড়ি রক্তপাত বন্ধ করা দরকার। যদি সামান্য মাত্র রক্ত পড়ে তাহা হইলে কাটা জায়গাটা পরিষ্কার করিয়া তার উপর টিঞ্চার-আয়োডিন ধরনের কোনো জীবাণুনাশক ঔষধ লাগাইয়া দিও। নোংরা ঘাসপাতা দিবার চেষ্টা করিও না, কারণ ও সবের মধ্যে নানা রকম মারাত্মক বীজাণু থাকিতে পারে। এক টুকরা তূলায় টিঞ্চার বেঞ্জইন লইয়া তাহাও কাটা জায়গার উপর লাগাইয়া দিতে পার। দেখিবে একটু পরে তূলাটা কাটার উপর একেবারে আঁটিয়া গিয়াছে ও রক্ত-পড়া বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু কাটাটা যদি আরো মারাত্মক হয়, আর যদি একেবারে হুড়হুড় করিয়া রক্ত পড়িতে থাকে? তখন তোমার প্রধান কাজ হইবে কাটা জায়গাটা খুব জোরে চাপিয়া ধরা কিংবা তার উপর দিকের জায়গাটা খুব কসিয়া বাঁধিয়া দেওয়া। অনেক সময় কাটা জায়গাটার উপর বরফ চাপিয়া ধরিলেও রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

নবম পরিচ্ছেদ

চুম্বক ও বিদ্যুতের কথা

১। **চুম্বক**—চুম্বকের কাজ লোহা নিকেল, কোবাল্ট প্রভৃতি ধাতুকে আকর্ষণ করা। আজকালকার টাকা, আধুলি, সিকি প্রভৃতির মধ্যে নিকেলের ভাগ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। তাই যদি চুম্বকের মুখে একটি টাকা ধর তাহা হইলে দেখিবে টাকাটি সেখানে আটকাইয়া গিয়াছে। কারখানায় কাজ করিবার

সময় কাহারো চোখে যদি লোহার গুঁড়া পড়ে তাহা হইলে চুম্বকের সাহায্যে উহা অনায়াসে বাহির করিয়া ফেলা যায়।

চুম্বকের প্রকার—আমরা সাধারণত যে-সব চুম্বক দেখি সেগুলিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এই তিন রকম চুম্বকের নাম : দণ্ড-চুম্বক খুর-চুম্বক ও চুম্বক-শলাকা। যেগুলিকে ছোট চ্যাপ্টা লাঠির মত দেখিতে সেইগুলিকে **দণ্ড-চুম্বক** বলা হয় ; যেগুলির চেহারা ঘোড়ার খুরের মত সেইগুলিকে **খুর-চুম্বক** বলা হয়। আর দুইদিক-সরু ইস্পাতের পাতের তৈয়ারী ছোট চুম্বককে বলে **চুম্বক-শলাকা**।

যে তিন প্রকার চুম্বকের কথা বলা হইল তাহা ইস্পাতের তৈয়ারী কৃত্রিম চুম্বক। আসল চুম্বক এক রকম পাথর, উহা খনিতে পাওয়া যায়। ইস্পাতের টুকরাকে আসল চুম্বক দিয়া ঘসিয়া কৃত্রিম চুম্বক করা হয়। কাঁচা লোহাও চুম্বক হয়, তবে উহাতে চুম্বকের শক্তি বেশিক্ষণ থাকে না। এসব চুম্বকের শক্তি কিন্তু বেশি নয়। কাঁচা লোহার বাঁকা দণ্ডের চারিদিকে তার জড়াইয়া উহার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালাইলে উহা খুব শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত হয়। এই চুম্বককে **বিদ্যুৎ-চুম্বক** বলে।

চুম্বকের ধর্ম—একটি দণ্ড-চুম্বকের মাঝ-বরাবর যদি সূতা বাঁধিয়া তাহা ঝুলাইয়া রাখ, তাহা হইলে দেখিবে তাহা আপনা আপনিই ঘুরিয়া এমন অবস্থায় আসিবে যে তাহার একটি প্রান্তের মুখ থাকিবে উত্তর দিকে এবং অপরটির মুখ থাকিবে দক্ষিণ দিকে। এই পরীক্ষা হইতেই বুঝিবে যে, চুম্বককে যদি মুক্ত

অবস্থায় ঝুলাইয়া রাখা হয় তাহা হইলে তাহা উত্তর-দক্ষিণ বরাবর থাকে। উত্তর দিকে যে প্রান্ত তাহাতে লাল কালির দাগ দাও এবং দক্ষিণ দিকের যে প্রান্ত তাহার উপর নীল কালির দাগ দাও। তাহা হইলে লাল-চিহ্নের প্রান্তকে চুম্বকের **উত্তর-মেরু** বলা হইবে এবং নীল-চিহ্নিত প্রান্তকে বলা হইবে **দক্ষিণ-মেরু**।

এইবার আর একটি পরীক্ষা কর। একটি স্ট্যাণ্ডের উপর



একটি চুম্বকশলাকাকে এমন ভাবে বসাইয়া দাও যাহাতে তাহা এদিক-ওদিক ঘুরিতে পারে। এই অবস্থায় শলাকাটির একপ্রান্ত নিশ্চয়ই উত্তর দিকে মুখ করিয়া থাকিবে এবং অপর প্রান্ত মুখ করিয়া থাকিবে দক্ষিণ দিকে। তারপর তোমার লাল-নীল চিহ্নিত চুম্বকদণ্ডটি লইয়া পরীক্ষা শুরু কর। চুম্বক-দণ্ডের উত্তর-মেরু চুম্বক-শলাকার উত্তর-মেরুর নিকট ধর, দেখিবে শলাকার উত্তরমেরু দূরে সরিয়া যাইতেছে। চুম্বক-দণ্ডের দক্ষিণ-মেরু চুম্বক-শলাকার উত্তর মেরুর দিকে ধরিলে দেখিবে শলাকার উত্তর মেরু দণ্ডের দক্ষিণ মেরুর দিকে সরিয়া আসিতে চাহিতেছে। এই পরীক্ষা হইতে বুঝা যায়, চুম্বকের ভিন্ন জাতীয় মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং এক জাতীয় মেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে (ঠেলিয়া দেয়)।

তাহা হইলে তোমরা চুম্বকের তিনটি ধর্ম জানিলে—

(১) চুম্বক লোহা, নিকেল, কোবাল্ট প্রভৃতি ধাতুকে আকর্ষণ করে।

(২) ঝুলান চুম্বক উত্তর-দক্ষিণ মুখী হইয়া থাকে।

(৩) চুম্বকের ভিন্ন জাতীয় মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং এক জাতীয় মেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে।

চুম্বকের ব্যবহার—আজকাল চুম্বকের বহু প্রকার ব্যবহার দেখা যায়। জাহাজ এবং উড়োজাহাজে যে দিক্-নির্ণয় যন্ত্র বা কম্পাস্ ব্যবহার করা হয় উহা চুম্বক-শলাকার সাহায্যে তৈয়ারী। ইহা ছাড়া টেলিফোন, বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, মোটর গাড়ির এঞ্জিন প্রভৃতিতে বিদ্যুৎ-চুম্বকের প্রয়োজন হয়।

২। বিদ্যুৎ

বিদ্যুতের ব্যবহার—বিদ্যুতের কাজ যে আজকাল কত রকমের তাহা নিশ্চয়ই বলিয়া দিতে হইবে না। শহরে বিদ্যুতের আলোয় পথ দেখিতে পাই, রাত্রে ঘরে বসিয়া লেখাপড়া করিতে পারি। গরমের সময় বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়ায় শরীর জুড়ায়। বিদ্যুতের সাহায্যেই টেলিফোন-টেলিগ্রাফে সংবাদ যাতায়াত করে। বিদ্যুৎ না থাকিলে বড় বড় কলকারখানা চলিত না, রেডিও চলিত না, টর্চ-লাইট জ্বলিত না, শহরে ট্রামগাড়িও চলিত না। কোন কোন স্থানে বিদ্যুতের সাহায্যে রেলগাড়িও চালান হয়। চিকিৎসার ব্যাপারেও বিদ্যুৎশক্তিকে কাজে লাগান হয়। আজকাল উন্নততর দেশে বিদ্যুতের সাহায্যে কাপড় কাচা, বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, রান্না করা ইত্যাদি বহু গৃহকর্মও করা হইয়া থাকে।

বিদ্যুৎ দুই প্রকারের—স্থির-বিদ্যুৎ এবং চল-বিদ্যুৎ।

(ক) **স্থির-বিদ্যুৎ**—স্থির-বিদ্যুৎ উৎপাদন করা খুব কঠিন নয় ; তোমরা নিজেরাও ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার।

একটি সিল্কের রুমাল কয়েক ভাঁজ করিয়া উহা দ্বারা একটি কাঁচের দণ্ডকে ঘসিতে থাক ; খানিকক্ষণ ঘসিবার পর দণ্ডটিকে ছোট ছোট কাগজের টুকরার নিকট ধর—দেখিবে কাগজের টুকরাগুলি কাঁচের দণ্ডটির দিকে লাফাইয়া লাফাইয়া উঠিতেছে। ইহার কারণ, কাঁচের মধ্যে ঘর্ষণের ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়াছে। তারই আকর্ষণে কাগজের টুকরাগুলি ঐ ভাবে লাফাইয়া

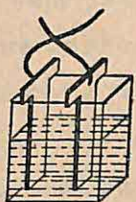


উঠিতেছে। মাথার চুলে গাটাপার্চার চিরুণী ঘসিলেও এই জাতীয় বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। গাটাপার্চার চিরুণী দিয়া চুল আঁচড়াইবার সময় পট্‌পট্‌ করিয়া শব্দ হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়াছ কি ? বিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার ফলেই তাহা হয়।

এই বিদ্যুৎ একস্থান হইতে অন্যস্থানে চালান দেওয়া যায় না। ইহা আমাদের বিশেষ কাজেও লাগে না।

(খ) **চল-বিদ্যুৎ**—বিদ্যুৎ যখন কোন জিনিসের ভিতর দিয়া চলে তখন তাহাকে চল-বিদ্যুৎ বলা হয়। সাধারণত ডায়নামোর সাহায্যে ইহা উৎপন্ন করা হয়। অল্প শক্তির চল-বিদ্যুৎ সহজেই উৎপন্ন করা যায়।

সালফিউরিক এ্যাসিডের সহিত জল মিশাইয়া তাহা একটি কাঁচের পাত্রে রাখ; পাত্রটিকে একেবারে ভর্তি করিও না। তারপর একটি দস্তার ও একটি তামার পাত যোগাড় করিয়া, উভয়েরই উপর দিকে তামার তার আটকাইয়া দাও। এবার দস্তা ও তামার পাত দুইটির নীচের অংশ এ্যাসিডের ভিতর এমন ভাবে ডুবাইয়া দাও যাহাতে তাহারা পরস্পরকে স্পর্শ না করে। এখন তামার তারের খোলা প্রান্ত দুইটি একত্রে আটকাইয়া দিলে দেখিবে ইহার মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ চলিতেছে। ইহাই চল-বিদ্যুৎ।



পূর্বে বিদ্যুতের যে-সব ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা এই চল-বিদ্যুৎ। তারের ভিতর দিয়া এই বিদ্যুৎ চলিয়া আমাদের কত উপকার করিতেছে। কিন্তু নিজের শরীরের ভিতর দিয়া ইহা চলিলে আর রক্ষা নাই। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মাংসপেশী আড়ষ্ট হইয়া যায় এবং বিদ্যুতের শক্তি বেশি হইলে মানুষ মারাও যায়। কাজেই যে-সব তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলে তাহা রবার প্রভৃতি এমন জিনিস দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয় যাহার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলিতে পারে না।

দশম পরিচ্ছেদ

খাতার কথা

প্রকৃতির নূতন রূপ—বিজ্ঞানের নানা কথা তোমরা শিখিলে—গাছগাছড়ার কথা, পোকামাকড়ের কথা, আকাশের কথা, জমির কথা, হাওয়ার কথা, জলের কথা, আরো কত কি! এতরকম কথাশিখিয়াছ বলিয়াই এইবার যখন তোমরা প্রকৃতির দিকে তাকাইবে তখন প্রকৃতিকে একেবারে নূতন চোখে দেখা যাইবে। আগে গাছগাছড়ার দিকে তাকাইয়া তোমাদের যাহা মনে হইত এখন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি কথা মনে জাগিবে—গাছটির শিকড় কিরূপ, কাণ্ড কিরূপ, পাতার কোনো বৈশিষ্ট্য আছে কি না, ফুলের গড়নই বা ঠিক কেমন। কিংবা ধর, আগে একটি শুঁয়াপোকা দেখিলে কিই বা মনে হইত? এখন তাহা দেখিলে তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগিবে উহা প্রজাপতির লার্ভা কিনা। বনের ভিতর দিয়া পথ চলিতে চলিতে এখন তোমাদের মনে হইবে, সন্ধান করিয়া দেখা যাক গাছে কোনো গুটিপোকার গুটি পাওয়া যায় কিনা। রাঙা মাটির পথ ধরিয়া চলিবার সময় তোমাদের মনে পড়িবে, এই মাটির ভিতর লোহা আছে বলিয়াই ইহার রং এমন লাল। রাত্রে আকাশের দিকে তাকাইয়া তোমরা এখন ধ্রুবতারাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে, পারিবে নক্ষত্রমণ্ডলগুলিকে চিনিতে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এইরূপ। প্রকৃতি যেন নূতন করিয়া তোমাদের কাছে ধরা দিবে।

গুছাইয়া লেখা— কিন্তু শুধু এইভাবে দেখিলেই তো হইবে না ; সব কথা মনেও রাখিতে হইবে। সেইজন্য যখন যাহা শিখিবে তাহা তখনই খাতায় লিখিয়া রাখিবে। কিভাবে লিখিয়া রাখিলে সবচেয়ে সুবিধা হয় সে কথাও জানা দরকার।

লিখিবার ব্যাপারে যাহা প্রধান কথা তাহা হইল গুছাইয়া লেখার অভ্যাস। গুছাইয়া লেখা মানে কি ? ধর তুমি রাত্রের আকাশে ছায়াপথের দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে কয়েকটি জিনিস লক্ষ্য করিয়াছ ; আবার বনের মধ্যে চড়ুই-ভাতি করিতে গিয়া কয়েক রকমের গাছ এবং গুটিপোকা সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় দেখিয়াছ। এই সমস্ত কথাই যদি তুমি একই খাতায় একসঙ্গে জড়াইয়া লিখিয়া রাখ তাহা হইলে কোন লাভ হইবে না। পরে আবার ছায়াপথ সম্বন্ধে বা আকাশ সম্বন্ধে নূতন কিছু যখন চোখে পড়িবে তখন আগে কি লিখিয়া রাখিয়াছিলে তাহা খোঁজ করিয়া বাহির করাই তোমার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িবে।

তাই প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা খাতা করিবে। যে খাতায় উদ্ভিদের কথা লিখিবে সে খাতায় পোকা-মাকড়ের সম্বন্ধে কিছু লিখিবে না। পোকামাকড়ের কথা লিখিবার জন্য যে খাতা করিবে, সে খাতায় শুধু পোকা-মাকড়দের কথাই থাকিবে। এইভাবে আকাশ, মাটি প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে এক একটি খাতা রাখিবে।

নমুনা সংগ্রহ—দ্বিতীয় হইল নমুনা সংগ্রহের কথা। গাছগাছড়ার ব্যাপারে কি ভাবে নমুনা সংগ্রহ করিতে হয় এবং তাহা কিরূপে রক্ষা করা সম্ভব এ আলোচনা পূর্বেই করা

হইয়াছে। অবশ্য সকল বিষয় সম্বন্ধেই নমুনা সংগ্রহ করার কথা ওঠে না। যেমন ধর, নমুনা হিসাবে তুমি আকাশ হইতে একটি কালপুরুষ পাড়িয়া আনিতে তো সত্যই পার না! কিন্তু তবুও অনেক বিষয় সম্বন্ধেই তোমার পক্ষে নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব। বিশেষ করিয়া গাছগাছড়া, পোকা-মাকড়, মাটির নমুনা প্রভৃতি। পোকা-মাকড়গুলি শুকাইয়া খাতায় আটকাইয়া রাখা যদি অসুবিধা-জনক মনে হয় তাহা হইলে একটি আলাদা পিচ্‌বোর্ডের উপর সেগুলির নমুনা আলপিন দিয়া আটকাইয়া দাও; প্রত্যেকটি নমুনার তলায় নম্বর লিখিয়া রাখ এবং পোকামাকড়ের খাতায় ঐ নম্বর লিখিয়া সেই পোকা সম্বন্ধে যাহা লক্ষ্য করিয়াছ তাহা লিখিয়া রাখ। মাটির নানা প্রকার নমুনা সংগ্রহ করিয়া এক এক নমুনা এক একটি শিশিতে রাখিয়া শিশির গায়ে লেবেল্ আঁটিয়া দাও এবং যে খাতায় মাটির কথা লিখিবে তাহাতে ঐ লেবেলের নম্বর বসাইয়া তোমার মন্তব্য লিখিয়া যাও।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সংঘ-সমিতির কথা

একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার আনন্দ কত বেশি। আর শুধু আনন্দই নয়; ইহাতে কাজও কত ভাল হয়। তাই বিজ্ঞান শিখিবার পর তোমরাও বিজ্ঞান লইয়া যখন আরো কাজ করিতে অগ্রসর হইবে তখন অনেকে মিলিয়া একসঙ্গে কাজ করিবার চেষ্টা করিও, দল গড়িবার চেষ্টা করিও—

দেখিতে পাইবে কাজ করিতে কত ভাল লাগে, এবং কাজও কত সুন্দররূপে করা যায়।

তোমাদের পক্ষে কিরূপ দল গড়া সম্ভব তাহার দুই-একটি নমুনা দেওয়া হইতেছে—

১। **প্রকৃতি-বিজ্ঞান ক্লাব**—খেলাধূলার জন্য পাড়ায় পাড়ায় যেরূপ ক্লাব গড়া হয় সেইরূপ বিজ্ঞানের আলোচনার জন্যও ক্লাব গড়িতে পার। এই ক্লাবে নিয়মিত বৈঠক হওয়া দরকার। প্রত্যেক সভ্য কি কি দেখিয়াছে ও পড়িয়াছে তাহা ক্লাবের বৈঠকে বলিবে এবং অন্যেরা তাহা লইয়া আলোচনা করিবে। প্রত্যেকে যে-সব নমুনা সংগ্রহ করিয়াছে তাহা ক্লাবের বৈঠকে দেখানো হইবে এবং সকলে মিলিয়া তাহার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবে ও আলোচনা করিবে। ক্লাবের তরফ হইতে নিয়মিত ভাবে দল বাঁধিয়া বেড়াইতে বাহির হওয়া দরকার। বেড়াইতে বাহির হইয়া সকলেই বিজ্ঞানের তথ্য ও নমুনা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবে এবং তাহা লইয়া বাকী সকলের সহিত আলোচনা করিবে। তাহা ছাড়া সম্ভব হইলে যাদুঘর, বোটানিক্যাল গার্ডেন, ইত্যাদি জায়গা দেখিতে যাওয়া দরকার। সেইখানে বিজ্ঞানের নানা রকম নমুনা সংগ্রহ করা আছে। তাহা দেখিয়া ও সকলে মিলিয়া সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অনেক কথা জানিতে পারিবে। ক্লাবের পক্ষ হইতে একটি হাতে-লেখা পত্রিকা বাহির করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই পত্রিকায় ক্লাবের খবর থাকিবে এবং ক্লাবের সভ্যেরা বিজ্ঞান বিষয়ে যে-সব তথ্য যোগাড় করিয়াছে তাহা লেখা থাকিবে। সম্ভব হইলে ক্লাবের

নিজস্ব একটি নমুনা-ঘর করিতে হইবে। প্রত্যেক সভ্য যে-সকল নমুনা সংগ্রহ করিতেছে তাহা ঐ ঘরে গুছাইয়া রাখা হইবে।

২। **কৃষক সমিতি**—আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের অধিকাংশ কৃষকই শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা পায় না। অথচ কৃষকদের বাদ দিয়া আমাদের দেশের উন্নতি কিছুতেই সম্ভব নহে। অবশ্য কৃষকদের উন্নতি সাধনের সমস্যা নানামুখী। কিন্তু মনে রাখিও, এই সমস্যা সমাধানের কাজে তোমাদেরও একটা দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব তোমরা নিশ্চয়ই পালন করিবে।

কিরূপে করিবে? প্রধান কাজ হইল, গাঁয়ে গাঁয়ে কৃষক-সমিতি গঠন করা। গ্রামের কৃষকেরা যাহাতে এই সমিতির সভ্য হইতে রাজী হয়, তাহার জন্য তাহাদের নিকট যাইতে হইবে, তাহাদের বুঝাইতে হইবে। এই সমিতির অবশ্য নানারূপ কাজকর্ম থাকিবে। তাহার মধ্যে তোমাদের উপর কোন্ কাজের ভার? তোমরা কৃষকদের মধ্যে বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রচার করিবে। গাছগাছড়ার কথা, জমির কথা, সারের কথা—নানা কথা তাহাদের সহিত মিলিয়া আলোচনা করিবে। এই আলোচনার ফলে দেখিবে কৃষকেরাও অনেক নূতন কথা শিখিতেছে এবং তোমরাও তাহাদের নিকট হইতে অনেক নূতন কথা শিখিতেছ। কৃষকদের মধ্য হইতে নিরক্ষরতা ও কুসংস্কার দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে তাহারা কাজকর্মের জন্য ভাল সুযোগ-সুবিধা পায়, তাহার চেষ্টা করিবে। আধুনিক ধরনের চাষের যন্ত্রপাতি ও ফসলের প্রদর্শনী করিয়া তাহাদের মনে উৎসাহ জাগাইবার চেষ্টা করিবে।

৩। **প্রচার-পত্র**—তোমরা চেষ্টা করিলে প্রত্যেক গাঁয়ে কৃষকদের জন্য একটি প্রচার-পত্র বাহির করিবার ব্যবস্থা করিতে পার। এই প্রচার-পত্রে নানারূপ কথা লিখিতে হইবে এবং ছবির সাহায্যে ইহাকে আকর্ষণের বস্তু করিতে হইবে। জমির কথা, সারের কথা, বীজের কথা প্রভৃতি ছাড়াও ইহাতে লেখা দরকার আবহাওয়ার কথা। খবরের কাগজ পড়িয়া তোমরা আবহাওয়ার সংবাদ পাইবে। তাহা এই প্রচার-পত্রে লিখিয়া দেওয়া দরকার। কবে বৃষ্টি পড়িবার সম্ভাবনা বা ঝড় আসিবার সম্ভাবনা, এই সকল কথা কৃষকদের পক্ষে জানা খুবই প্রয়োজন। শিক্ষার সুযোগ পায় নাই বলিয়া অনেক জায়গায় কৃষকেরা নিরক্ষর। তাই শুধু প্রচার-পত্র বাহির করিলেই হইল না; তাহাদের ডাকিয়া এই প্রচার-পত্র পড়িয়া শোনানোও প্রয়োজন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শিল্প ও বিজ্ঞান

(বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য লিখিত)

শিল্পোন্নতি—পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় আজ আমাদের দেশের অবস্থা অনেক খারাপ। তাহার একটি কারণ হইল, আমাদের দেশে শিল্পের উন্নতি হয় নাই। অথচ, শিল্পের উন্নতি না হইলে দেশের উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। শিল্পের উন্নতি বলিতে দেশে বড় বড় কলকারখানা গড়িয়া উঠিবার কথাই আসে। আমাদের দেশে কলকারখানা কত কম! অথচ, কি

বিপুল ও বিরাট আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনবল ইহা ঠিকমত কাজে লাগাইয়া যদি দেশের শিল্প-উন্নতির চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে আমাদের দেশের সম্পদ নিশ্চয়ই অনেক বাড়িয়া যাইবে।

কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতি না হইলে শিল্পের উন্নতিও সম্ভব নয়। তোমরা এখন হইতেই বিজ্ঞানের নানা রকম তথ্যাদি খুব ভাল করিয়া শিখিবে। তাহা হইলে বড় হইয়া তোমরা নিজেরাই দেশে কলকারখানা গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

কুটীর শিল্প—আমাদের দেশ এককালে নানারূপ কুটীর-শিল্পেও খুব উন্নত ছিল। কতকগুলি শিল্প ছিল পৃথিবী-বিখ্যাত। কিন্তু নানা কারণে উহার অনেক কিছুই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আজ আমাদের দেশ স্বাধীন, তাই আজ যদি আমাদের দেশের উন্নতির কথা ভাবিতে হয় তাহা হইলে এই কুটীর শিল্পগুলির কথাও ভুলিলে চলিবে না।

এই কুটীর শিল্পের উন্নতি সাধন করিবার জন্য কারিগরদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের প্রয়োজন আছে। আজকের পৃথিবীতে অনেক নূতন নূতন আবিষ্কার হইয়াছে এবং কুটীর শিল্পের বেলায় সেগুলি প্রয়োগ হইলে কুটীর শিল্পের কতই না উন্নতি হইতে পারে। তাই এই জ্ঞান কারিগরদের মধ্যে বিতরণ করা দরকার যাহাতে তাহারা মামুলি উপায় ছাড়িয়া নূতন ও উন্নত উপায় অবলম্বন করিতে পারে।

যেমন ধর, তাঁতির পক্ষে জানা দরকার সূতায় রং করিবার প্রণালী। এই রং সম্বন্ধে আজকাল কত আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক

তথ্য বাহির হইয়াছে। তাহা দেশের তাঁতিদের জানা দরকার।

কিংবা ধর, মাটির পাত্রের উপর চকচকে পালিস ধরাইবার পদ্ধতি। আমাদের দেশের কুমোরদের পক্ষে এই আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি জানিবার উপায় নাই। অথচ তাহাদের যদি এই পদ্ধতিটি জানানো হয় তাহা হইলে তাহাদের কাজ কতই না সুন্দর ও ভাল হইতে পারে।

মনে রাখিও, বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণ করে নানা দিকে। কুটীর শিল্পের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যে-কল্যাণ সম্ভব তাহা আমাদের পক্ষে অর্জন করিবার চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। সেইজন্য কারিগরদের মধ্যে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের তথ্য প্রচারিত হওয়া দরকার।

হাতে কলমে কাজ—তোমরা বিদ্যালয়ে বা বাড়িতে হাতে-কলমেও অনেক কাজ করিয়া থাক। এখন হইতে প্রত্যেকটি কাজ করিতে বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি খোলা রাখিও। "কেন ?" প্রশ্নটি যেন মনের মধ্যে লাগিয়াই থাকে। ছায়ার মধ্যে গাছ কেন ভাল হয় না, জমিতে কেন ফসল ভাল জন্মে না, জলে কেন সাবানের ফেনা হয় না, বর্ষায় কেন এত বৃষ্টি হয়—বিজ্ঞানের কাছ হইতেই এসব 'কেন'র সদুত্তর পাওয়া যাইবে। কেন হয় না তাহা জানিতে পারিলে, কিরূপে হইবে তাহাও তুমি চিন্তা করিয়া বাহির করিতে পারিবে ; এবং এইরূপেই বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রতি কাজে তোমাকে সাহায্য করিবে।

অনুশীলনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। গাছের বিভিন্ন অংশের নাম কর।

২। শিকড় গাছের কি কাজ করে? প্রধান মূল ও অস্থানিক মূলে প্রভেদ কি?

৩। শাখা-মূল, মূল-রোম, ঝুরি, ঠেস্-মূল, শোষক-মূল ও বায়বীয়-মূল কাহাকে বলে উদাহরণ সহ বুঝাইয়া দাও।

৪। কাণ্ডের কয়টি অংশ ও কি কি? পর্ব, পর্বমধ্য, কক্ষ-মুকুল, শীর্ষ-মুকুল, ও শাখা-মুকুল কাহাকে বলে?

৫। কাণ্ডের কাজ কি? বিভিন্ন রকম কাণ্ডের উদাহরণ দাও।

৬। পাতার কয়টি অংশ ও কি কি? পাতা গাছের কি কাজে লাগে?

৭। অঙ্গারাত্মকরণ কাহাকে বলে? সবুজ পাতা কিরূপে গাছের খাদ্য-প্রস্তুত করে তাহার বর্ণনা দাও।

৮। কি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিবে যে সূর্যের আলো ছাড়া পাতায় খাদ্য তৈয়ারী হয় না?

৯। স্টোমা ও প্রস্বেদন কাহাকে বলে? রাত্রিবেলায় বৃক্ষতলে বাস স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কেন?

১০। ফুলের কাজ কি? ফুলের কয়টি অংশ ও কি কি?

১১। জবা, অপরাজিতা ও ধুতুরা ফুলের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।

১২। পরাগ-মিলন কিরূপে হয় বুঝাইয়া দাও।

১৩। আতা ও আকন্দ গাছের পাতার বিন্যাসে প্রভেদ কি?

১৪। গাছের ত্বকের কাজ কি? উহা আমাদের কি কাজে লাগে?

১৫। গাছের দুইটি কচি ডাল কাটিয়া লইয়া একটি জলে ও অপরটি বায়ুতে রাখিয়া দিলে উহাদের কিরূপ পরিবর্তন হইবে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। ধান কাটা, ঝাড়া ও সংরক্ষণ কিরূপে করিতে হয় তাহার বর্ণনা দাও।

২। একটি ধানের গোলার বর্ণনা দাও।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১। পতঙ্গ কাহাকে বলে? কয়েকটি পতঙ্গের নাম কর।

২। পতঙ্গের জীবনে কয়টি অবস্থা আছে? গুটিপোকা, প্রজাপতি অথবা পিপীলিকার উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৩। গুটিপোকা ও প্রজাপতির তুলনা কর।

৪। কিউলেক্স ও অ্যানোফিলিস্ মশার তুলনা কর।

৫। কোন্ মশা কি রোগের বীজাণু বহন করে?

৬। পিপীলিকা কয় প্রকার ও কি কি? উহারা কে কি কাজ করে?

৭। মৌচাকে কয় প্রকার মৌমাছি থাকে? উহাদের দেহের গঠন ও কার্যের বর্ণনা দাও।

৮। ব্যাঙের দেহের গঠন বর্ণনা কর। উহার জীবনধারণ প্রণালী কিরূপ?

৯। একটি ব্যাঙের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা দাও।

১০। ব্যাঙকে উভচর প্রাণী বলা হয় কেন?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১। কঙ্কাল, শিরা, ধমনী, ও জালক কাহাকে বলে? মানুষের কঙ্কালে কয়টি হাড় আছে?

২। রক্ত-চলাচল-তন্ত্র দেহের কি কাজ করিয়া থাকে? চিত্রসহ উহার কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

৩। পাচন-তন্ত্রের বিভিন্ন অংশের গঠন ও কার্যের বর্ণনা দাও।

৪। ফুস্‌ফুসের কার্য কি ? উহার বর্ণনা দাও।

৫। সুষুম্না ও স্নায়ু কাহাকে বলে ? স্নায়ুতন্ত্র দেহের কি কাজ কিরূপে সম্পাদন করে তাহা বুঝাইয়া দাও।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১। মেঘ, কুয়াসা ও শিশিরে প্রভেদ কি ? বৃষ্টি হয় কিরূপে ?

২। চিত্রসহ বিভিন্ন প্রকার মেঘের বর্ণনা দাও।

৩। সূর্যের বর্ণনা দাও। সূর্য না থাকিলে কি ক্ষতি হইত ?

৪। চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে কোন্‌টি কত দূর ও কত বড় ?

৫। চন্দ্রের বর্ণনা দাও। চাঁদের কলঙ্ক কাহাকে বলে ?

৬। চন্দ্রকলা কাহাকে বলে ? চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি বলিতে কি বুঝায় ?

৭। নক্ষত্রমণ্ডল কাহাকে বলে ? কয়েকটি নক্ষত্রমণ্ডলের নাম কর ও বর্ণনা দাও।

৮। ধ্রুবতারা, সন্ধ্যাতারা, শুকতারা ও ছায়াপথ সম্বন্ধে কি জান ?

৯। সূর্যগ্রহণ কাহাকে বলে ? কখন কিরূপে সূর্যগ্রহণ হয় ?

১০। চন্দ্রগ্রহণ কাহাকে বলে ? কখন কিরূপে চন্দ্রগ্রহণ হয় ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১। মাটি কয় প্রকার ও কি কি ? উহাদের বর্ণনা দাও।

২। দো-আঁশ মাটি চাষবাসের পক্ষে সবচেয়ে ভাল কেন ?

৩। মাটির উর্বরতা বলিতে কি বুঝায় ? উর্বরতা নষ্ট হয় কিরূপে ?

৪। জমিতে সার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কি ? জৈব ও অজৈব সার কাহাকে বলে ?

৫ মাটির ক্ষয় বন্ধ করার উপায় কি ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১। জমির পর্যবেক্ষণ বলিতে কি বুঝায় ?

২। পুকুর ভাল রাখিতে হইলে কি করা উচিত ?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১। বায়ুর উপাদান কি কি ? মুক্ত বায়ু কাহাকে বলে ?

২। বায়ু কিরূপে দূষিত হয় ? বায়ু শোধনের উপায় কি ?

৩। বাসগৃহে কি কি উপায়ে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করা হয় ?

৪। জলের প্রয়োজনীয়তা কি ? বিশুদ্ধ জলের উপাদান কি কি ?

৫। জল কিরূপে দূষিত হয় ? দূষিত জলে কি কি অসুখ হয় ?

৬। পানীয় জল কি কি উপায়ে শোধন করা যায় ?

৭। মৃদু ও খর জল কাহাকে বলে ? খর জলকে কিরূপে মৃদু করা যায় ?

৮। ম্যালেরিয়া কিরূপে বিস্তার লাভ করে ? ম্যালেরিয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি ?

৯। কলেরা কিরূপে সংক্রামিত হয় ? গ্রামে কাহারও কলেরা হইলে কি কি বিষয়ে সাবধান হওয়া দরকার ?

১০। টাইফয়েড রোগের লক্ষণ কি ? উহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে কি করা প্রয়োজন ?

১১। কাহারও বসন্ত হইলে কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার ?

১২। যক্ষ্মা বিস্তার লাভ করে কিরূপে ?

১৩। আগুনে পোড়া, জলে ডোবা, কুকুরে কামড়ানো, সাপে কাটা, আঘাত লাগা প্রভৃতি দুর্ঘটনায় প্রাথমিক প্রতিবিধান কিরূপে করিতে হয় ?

১৪। কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও।

১৫। কাপড়চোপড়ে আগুন লাগিলে দৌড়ান উচিত নহে কেন ?

নবম পরিচ্ছেদ

১। চুম্বক কয় প্রকার ও কি কি? বিদ্যুৎ চুম্বক কাহাকে বলে?
২। চুম্বকের বিশেষ ধর্ম কি কি? কিরূপে উহা প্রমাণ করা যায়?
৩। কি কি কাজে চুম্বকের ব্যবহার হয়?
৪। বিদ্যুৎ কয় প্রকার ও কি কি? চলবিদ্যুৎ কিরূপে উৎপন্ন করা যায়?
৫। বিদ্যুৎ কি কাজে ব্যবহৃত হয়?

দশম পরিচ্ছেদ

১। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের খাতা কিরূপ হওয়া উচিত?
২। কিরূপে নমুনা সংগ্রহ করিতে হয় তাহার বর্ণনা দাও।

একাদশ পরিচ্ছেদ

১। তোমাদের শ্রেণীতে প্রকৃতি-বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে কি কি করিবে?
২। কৃষক-সমিতি কিরূপে পরিচালনা করা উচিত? প্রচার-পত্রের প্রয়োজনীয়তা কি?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১। কুটীর-শিল্পের উন্নতির জন্য তোমরা কি কি করিতে পার?
২। 'হাতে কলমে কাজ' বলিতে কি বুঝ? ইহার প্রয়োজনীয়তা কি?